Contents

কুরআন কি আললাহর বাণী

ডা.জাকির নায়েক

بسم الله الرحمن الرحيم

কুরআন কি আল্লাহর বাণী?

ডা. জাকির নায়েকের 'কুরআন কি আল্লাহর বাণী?' এ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ভাই আশরাফ মুহাম্মদী, ইসলামি অভিভাষণ 'আস্সালামু আলাইকুম' আপনার প্রতি রহমত বর্ষিত হোক বলে অডিটোরিয়ামে প্রবেশ করেন, একই সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিছু কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন। প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর ডা. জাকির নায়েক এবং সম্মানিত প্রধান অতিথি মি. রফিক দাদাকে ধন্যবাদ জানান, যিনি সাংবিধানিক আইনের প্রখ্যাত অথরিটি এবং ভারতের একজন সিনিয়র এ্যাডভোকেট। যে সব বিশেষ অতিথি দেশের বিভিন্ন শহর ও বিদেশ থেকে আগমন করেছেন, এমনকি ইসলামি অভিভাষণের মাধ্যমে অডিটোরিয়ামে সমাগত ভাই-বোনদেরও ধন্যবাদ জানান।

ঐ দিনের ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশন (I.R.F) কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও আয়োজক হিসেবে এবং কো-অর্ডিনেটর হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেন। তিনি ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশন-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, এটি মুম্বাইর একটি নিবন্ধনকৃত পাবলিক ট্রাস্ট, যা ১৯৯১ সালে বেশিরভাগ স্ববিবেচিত ইসলামের কল্যাণ প্রচার এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে অমুসলিমদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের নিমিত্তে গঠিত।

বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে ডা. মুহাম্মদী বলেন, আপনারা হয়তো জানবেন, 'কুরআন কি আল্লাহর বাণী?' এ বিষয়ের ওপর আলোচনার প্রয়োজন কী? আপনারা জানেন, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনরুদয় ঘটছে। মুসলমানদের প্রধান সাংবিধানিক গাইড আল-কুরআন, যে কিতাব মুসলমানদের একীভূতকরণ ও আন্তঃযোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। বর্তমান সময়ে ভারত এবং পশ্চিমাদের অপ্রীতিকর ভুল উদ্ধৃতি, অর্ধসত্যের ওপর ভিত্তি করে সমালোচনা, মূল বিষয়ের বাইরে ও অবৈজ্ঞানিক মিথ্যা বানোয়াট, যা ভুল তথ্য ও পক্ষপাত দুষ্ট লোককর্তৃক কুরআনের ওপর আক্রমণ করছে।

অতএব, ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশন চিন্তা ভাবনা করছে অদ্যকার সাধারণ আলোচনা যথেষ্ট উপযুক্ত হবে "কুরআন কি আল্লাহর বাণী?" এ বিষয়ের ওপর ডা. জাকির নায়েকের আলোচনা। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো বিষয়ের ওপর সঠিক ব্যাখ্যা এবং একই সাথে জনসাধারণের প্রশ্নপর্ব উন্মুক্ত রাখা। সবশেষে আমরা সাধারণ মানুষদেরকে মিথ্যার কবল থেকে সত্য বের করে আনার বিচারের ভার অর্পণ করলাম।

আমাদের এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব রফিক দাদা সাংবিধানিক আইনের প্রথিতযশা অথরিটি এবং ভারতের একজন প্রথম শ্রেণীর সিনিয়র আইনজীবী। ১৯৬৬ সালে তিনি মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে LML পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৮৭ সালে সিনিয়র আইনজীবী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের মামলাগুলো নিয়মিত দেখাশোনা করেন। সমসাময়িক মানবীয় বিষয়ও

মোটিভেশনের ওপর সচল জ্ঞানাধিকারের ভিত্তিতে জনাব দাদা মুম্বাই বার এসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। ১৯৯৪ সালের নভেম্বরে ভারত সরকার তাঁকে এডিশনাল সলিসিটর জেনারেল নিয়োগ করে পুরস্কৃত করেন। আমি সম্মানিত দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে জনাব রফিক দাদাকে উপস্থিত করতে পারি।

প্রধান অতিথির পরিচয়কে ঘিরে অদ্যকার বিষয় নির্বাচনের কারণ ব্যাখ্যা করে আলোচনার পর্বে ডা. মুহাম্মদ রফিক দাদাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা হল। অতপর ডা. মুহাম্মদ রফিক তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তুলে ধরেন।

আসসালামু আলাইকুম অদ্যকার প্রধান আলোচক, বিশিষ্ট শ্রোতামণ্ডলি, ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ, আমি আপনাদের সম্মুখে সার্বিক বিনয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। কারণ, সব বড় বড় জ্ঞানীর তুলনায় আমি খুবই সামান্য। তাই আপনাদের এখানে এক জেলের ছোট ঘটনাটি আলোকপাত করতে চাই। যে জেলে খুব ভোরে সূর্য ওঠার পূর্বে মাছ ধরতে যেত। পানিতে জাল নিক্ষেপ করে সে খুব ভারী একটা বস্তু পেল এবং এটা অন্ধকারে পরীক্ষা করে সে বুঝতে পারল পাথরের অনেক ছোট্ট খণ্ড। সুতরাং সে তার মনের আক্ষেপে একটার পর একটা পাথর পানিতে নিক্ষেপ করতে থাকল। কিন্তু যখন সে তার সর্বশেষ কয়েকটি পাথর ছুঁড়তে বাকি রইল, সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে সে দেখতে পেল, যা সে পাথর মনে করে পানিতে ফেলছিল সেগুলো প্রকৃতপক্ষে পাথর ছিল না বরং মূল্যবান মুক্তা ছিল। অতএব অন্ধকারে সে অজ্ঞতাবশত মুক্তাগুলোকেই পাথর মনে করে পানিতে নিক্ষেপ করছিল এবং একমাত্র আলোর কারণেই সে দেখতে পেল এবং তার ভুলের জন্য আফসোস করল, অন্ধকারের জন্যই তার পূর্ববর্তী সময়টা বৃথা গেল এবং মূল্যবান জিনিস হারালো।

মুসলিম জাহানের জানা আছে যে, বিশ্বের আলো ১৪০০ বছর পূর্বেই আলোকিত উঠেছিল যখন পবিত্র কুরআন নাযিল হয়। এটা প্রত্যেক মুসলমানের বিশ্বাসের আবশ্যকীয় অঙ্গ যে, আল-কুরআন আল্লাহর বাণী। এ বিষয়ে কোনো বিতর্কের সুযোগ নেই। এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়, এটা বিশ্বাসের বিষয়। এটাও মুসলিমদের বিশ্বাস যে, পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে ধর্ম পরিপূর্ণতা এসেছে এবং এ গ্রন্থের মধ্যে এটাও আছে যে, একে আল্লাহ হেফাজত করবেন। বস্তুত এটা পবিত্র কুরআনেরই মোজেযা যে, রাসূল (সাঃ)-এর সময় থেকে শত শত এবং হাজার হাজার লোক এবং বর্তমানে লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটিও হতে পারে একে হেফজ (মুখস্থ) করেছে, যাতে এটি শুধু সুন্দর হরফে কাগজেই লেখা থাকবে না বরং মানব হৃদয়ের মণি কোঠায় সংরক্ষিত থাকবে; যাতে কোনোদিন এটি মুছে যেতে না পারে। এটি সবসময়ই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য নির্ভেজাল অবস্থায়ই বহাল থাকবে।

আমার জন্য এটা খুবই আনন্দ ও গর্বের বিষয়, আপনারা আমাকে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করার উপযুক্ত মনে করেছেন। আমি বলি যে, এসব বিষয় মোকাবিলা করা ও কথা বলা আমাদের জন্য প্রয়োজন, কারণ আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি, যাকে বিজ্ঞানীরা, ক্যালকুলেটর ও বস্তুবাদের যুগ বলে আখ্যায়িত করেন। বিজ্ঞানকে ধর্মের কলঙ্কের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, অতএব, কুরআনের কিছু আয়াতেরও পুনরাবৃত্তি হওয়া জরুরি, যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির দিকে নির্দেশ করে, যে তা অনুসন্ধান করে।

ফ্রান্স একাডেমি অব সাইন্স-এর মরিস বুকাইলি ১৯৭৮ সালের ১৪ জুন লন্ডনের এক বিশাল সমাবেশে ভাষণ দেন। তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল 'পবিত্র কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান'। তিনি কুরআনের অনেক আয়াত উল্লেখ করেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেন যে, কুরআনে ১৪০০ বছর পূর্বে যা বর্ণনা করা হয়েছিল, বর্তমানে

বিজ্ঞানের দ্বারা তাই আবিষ্কৃত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন, পবিত্র কুরআনে এ সত্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাত, সূর্য এবং চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকেই নিজস্ব গতিতে নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। এটা ঐ সময়ে অবতীর্ণ হয়, যখন পৃথিবীর অধিকাংশ কিংবা সারাবিশ্বের মানুষ বিশ্বাস করতো যে, পৃথিবী সমান এবং এর বিপরীত কেউ বলার সাহস করতো না, বললে হত্যা, ফাঁসি অথবা পাথর মারা হতো, এজন্য যে, সে পাগল বা উন্মাদ।

যে বিখ্যাত বিষয়ের ওপর আলোচনা চলবে তা উপলব্ধি করা কঠিন হলেও আমাদের মাঝে খুবই খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা ডা. জাকির নায়েক উপস্থিত রয়েছেন। বেশিরভাগ লোক তাঁর বক্তব্য ও তাঁর জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত। ডা. জাকির নায়েককে সকলে জানেন, তাঁর ৩০ বছরের স্বল্পতম পরিসর জীবনে বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ের ওপর অগণিত বক্তৃতা উপস্থাপন করেছেন। তিনি এদেশে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশে শতাধিক সভায় ভাষণ প্রদান করেছেন। তিনি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন জায়গায়, বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন।

সাম্প্রতিককালের বড় চিন্তাবীদ আহমেদ দীদাত অত্যন্ত আনন্দের সাথে ডা. জাকির নায়েককে দীদাত প্লাস বলেন। সুতরাং আমাদের সামনে রয়েছে দীদাত প্লাস এবং এই বড় বিষয়টি আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমরা শক্তি পাই, আমরা বিনয় লাভ করি, যেন আল্লাহ তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ আমাদের ওপর বর্ষণ করেন। আপনাদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ।

মি. রফিকের বক্তব্যের রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই ডা. মুহাম্মদ শ্রোতামণ্ডলিকে সুবিধাজনকভাবে সবার সাথে মিলে নিজ নিজ আসনে বসতে বলেন। অতঃপর তিনি ডা. জাকির নায়েককে নির্বাচিত বিষয় 'কুরআন কি আল্লাহর বাণী?' এর ওপর আলোকপাত করার আহ্বান জানান।

ডা. জাকির নায়েক তাঁর আলোচনার প্রারম্ভে বলেন, "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।"

সম্মানিত অতিথি মি. রফিক দাদা, যিনি প্রধান অতিথি, বিজ্ঞ পণ্ডিতবৃন্দ, মুহতারাম বয়োজ্যেষ্ঠগণ এবং এই মহতি সভার আমার প্রাণ প্রিয় ভাই ও বোনেরা "আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু" আপনাদের সবার প্রতি সর্বশক্তিমান আল্লাহর শান্তি, করুণা ও দয়া বর্ষিত হোক, অদ্যকার আলোচনার বিষয় "কুরআন কি আল্লাহর বাণী?"

ইসলামের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

অনেক ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন এ পৃথিবীতে পদচারণা শুরু করে, তখন থেকেই ইসলামের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ পৃথিবীতে অনেক অহী ও অনেক রাসূল পাঠিয়েছেন সঠিক পথপ্রদর্শক হিসেবে। পূর্ববর্তী সব নবী-রাসূল শুধু তাঁর জনগণ ও জাতির জন্য এবং তার আনীত বাণী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বহাল ছিল। ঐ কারণে তাঁরা যে মোযেজাগুলো প্রদর্শন করেছেন, যেমন সাগরকে বিভক্তিকরণ, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা এগুলো ঐ সময়ের জন্য, যা আমাদের পক্ষে আজ আর পরীক্ষা করা সম্ভব নয়।

রাসূল (সাঃ) পূর্ণ মানবতার জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল এবং তাঁর বাণী চিরস্থায়ী। আল কুরআনের সূরা আম্বিয়ায় উল্লেখ আছে–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

অর্থাৎ, আমি আপনাকে জগতবাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।

যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল এবং তাঁর বাণী ছিল চিরস্থায়ী এজন্য তাঁকে আল্লাহ প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা চিরস্থায়ী এবং আমাদের দ্বারা পরীক্ষাযোগ্য হতে হবে। যদিও নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অনেক অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন, যেগুলো হাদীস শরীফে উল্লেখ পাওয়া যায়, তবুও তিনি এর ওপর জোর দেন নি। যাঁরা মুসলমান তাঁরা এ সব অলৌকিক ক্ষমতায় এক বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করেন।

পবিত্র কুরআন হলো চূড়ান্ত মুজিযা

আমাদের গর্বের বিষয় যে, পবিত্র কুরআন হলো সেই চূড়ান্ত মুজিযা বা অলৌকিক ক্ষমতা – যা মহান আল্লাহ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে প্রদান করেছেন। আল-কুরআন সর্ব সময়ের জন্য মুজিযা। এটি নিজেই ১৪০০ বছর পূর্বে মুজিযা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছে। পুনরায় সর্বকালের জন্য নিশ্চিত করা যায়। সংক্ষেপে, বলা যায় মুজিযার মুজিযা। সম্ভবত একটা বিষয় মুসলমান ও বিধর্মীদের কাছে সাধারণ যে, প্রথমবার আরবের মক্কা নগরীতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নামে এক ব্যক্তি যিনি আল-কুরআন তিলাওয়াত করেছিলেন।

কুরআনের উৎস বিবেচনায় মূলত তিন প্রকারের অনুমান দেখা যায়। তাহলো:

১. কুরআনের লেখক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তা সচেতনভাবে, অর্ধসচেতনভাবে অথবা অচেতনভাবে (যাই হোক না কেন?)

২. হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অন্য কোন মানবীয় উৎস থেকে, অথবা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ থেকে একে গ্রহণ করেছেন।

৩. কুরআনের কোন মানব লেখক নেই, বরং এটি আক্ষরিক অর্থেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী।

আসুন আজ আমরা এ তিনটি অনুমানের পরীক্ষা তথা বিচার বিশ্লেষণ করি–

১. হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সচেতন, অর্ধসচেতন অথবা অচেতনভাবে নিজেই এর রচয়িতা বা প্রণেতা। এটা খুবই অস্বাভাবিক, কোনো ব্যক্তির ঐশী বিষয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা যখন সে কোনো বড় ধরনের কাজের দায়িত্ব অস্বীকার করে। এটা আক্ষরিক বা বৈজ্ঞানিক যে কোনো দিক দিয়েই হোক না কেন। কিন্তু প্রাচ্যবিদেরা কুরআনের মূলেই এ সন্দেহ পোষণ করেছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং নিজেই কুরআনের রচয়িতা ছিলেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সবসময় বলেছেন যে, আল-কুরআন আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কখনোই স্বীকার করেন নি যে, তিনি পবিত্র কুরআনের প্রণেতা ছিলেন। বস্তুত তিনি সবসময় ঘোষণা করেছেন যে, এটি মহান আল্লাহর তরফ থেকে নাযিলকৃত। অন্য চিন্তা করা অযৌক্তিক এবং

এর অর্থ তিনি মিথ্যা বলেছিলেন। ইতিহাস আমাদের বলে, নবুওয়াত প্রাপ্তির ৪০ বছর তিনি কখনো মিথ্যা বলেছেন এমন প্রমাণ নেই এবং সমসাময়িক ব্যক্তিরা তাঁকে একজন সৎ, মহৎ, চরিত্রবান ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তারা তাঁকে 'আল-আমীন' বা 'বিশ্বাসী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ উপাধি শত্রু-মিত্র নির্বিশেষেই তাঁকে দিয়েছিল। আল্লাহ না করুক, যারা মহানবী (সাঃ)-কে মিথ্যাবাদী বলেছিল, তাঁরা নবুওয়াত প্রাপ্তির পরেই বলেছিল, অথচ তারা তাদের মূল্যবান জিনিসগুলো নিরাপত্তার জন্য তাঁর নিকটই গচ্ছিত রাখত। তারপর কেন একজন সৎ লোক মিথ্যা বলবেন যে, কুরআন আল্লাহর বাণী এবং তিনি একজন নবী?.......

প্রাচ্যবিদদের দাবি পরীক্ষা করে দেখি। কেউ কেউ বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কুরআনের দাবি করেছিলেন এবং আরো বলেন যে, তিনি নবী হয়েছিলেন দুনিয়ার মোহে। আমি একমত যে, অনেক ব্যক্তি দুনিয়াবী মোহে নবী, সাধক বা প্রচারক হিসেবে মিথ্যা দাবি করে। তাছাড়া তারা সম্পদও লাভ করে বিলাসবহুল জীবনযাপনও করে। সারা বিশ্বে বিশেষ করে ভারতে এর অনেক প্রমাণ বিদ্যমান।

মহানবী (সাঃ) নবুওয়াত লাভের পূর্বে আর্থিক দিক দিয়ে অনেক সচ্ছল ছিলেন। তিনি হযরত খাদীজা (রা) নাম্নী একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মহিলাকে ২৫ বছর বয়সে নবুওয়াতের ১৫ বছর পূর্বে সাদী করেছিলেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর জীবন ছিল আকর্ষণীয়। অথচ নবুওয়াত লাভের পর ইমাম নববী (র)-এর হাদীসের সংগ্রহ অনুযায়ী, 'রিয়াদুস সালেহীন' এর হাদীস নং ৪৯২ মহানবী (সাঃ)-এর বিবি হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে এমনও অনেক সময় হতো যে, এক মাস দুই মাস নবী করীম (সাঃ)-এর ঘরে চুলাই জ্বলে নি; এমনকি তাদের রান্না করার মতো খাবার উপকরণ ছিল না। তাঁরা পানি এবং শুকনা খেজুর খেয়ে জীবন-যাপন করতেন সঙ্গে মদিনাবাসীদের দেয়া ছাগলের দুধ। এটা শুধু অস্থায়ী চিত্রই ছিল না, এটা মূলত নবী করীম (সাঃ)-এর জীবন-যাপন পদ্ধতি। রিয়াদুস সালেহীনের ৪৬৫ ও ৪৬৬ নং হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়, হযরত বিলাল (রা) বলেন, হযরত নবী করীম (সাঃ) যখনই কোনো হাদিয়া গ্রহণ করতেন, তখন তিনি তা দরিদ্র ও অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন এবং কখনোই নিজের জন্য রেখে দিতেন না। তবে কেন আপনি সন্দেহ [illegible] নবী করীম (সাঃ) বস্তুগত লাভের জন্য (নাউযুবিল্লাহ) তিনি মিথ্যা বলেছেন। এখানে কুরআনের আয়াতও [illegible] একে অস্বীকার করে। সূরা, বাকারার ৭৯ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, সেসব লোকের জন্য ধ্বংস অনিবার্য যারা নিজেরা নিজেদের হাতে কিছু বিধি লিখে নেয়, (তারপর) বলে, এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে অবতীর্ণ (শরিআতের) বিধান। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন তা দিয়ে পৃথিবীর সামান্য কিছু স্বার্থ তারা ক্রয় করে নিতে পারে। অথচ তাদের হাতের এ আয় তাদের ধ্বংসের কারণ হবে, যা কিছু তারা অর্জন করেছে, তাও তাদের ধ্বংসের কারণ হবে।

এ আয়াত সে সব ব্যক্তিদের ধ্বংস কামনা করা হয়েছে, যারা নিজের হাতে গ্রন্থ লিখে বলে এটা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর কিতাব অথবা যারা আল্লাহর কালামকে নিজের স্বার্থে বিকৃত করে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যদি নিজ হস্তে কিতাব রচনা করে মহান আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করতেন তাহলে তাঁর জীবনের যে কোনো পর্যায়ে তা আল্লাহ অনাবৃত করে দিতেন। অনেকে বলে থাকে যে, মহানবী (সাঃ) আল-কুরআনকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন? এবং নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করেছিলেন– মর্যাদা, ক্ষমতা, গৌরব এবং নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য। যে ব্যক্তি ক্ষমতা, মর্যাদা, নেতৃত্ব এবং মর্যাদা চায় তাদের গুণাবলি কী

রকম? সে মূল্যবান পোশাক পরে, সে উন্নতমানের ভালো খাবার খায়, সে সুউচ্চ প্রাসাদে বসবাস করে, তার দেহরক্ষী থাকে ইত্যাদি।

মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন সরলতা ও নম্রতার বিস্ময়কর আদর্শ

আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজের ছাগলের দুধ নিজ হাতে দোহন করতেন। নিজের কাপড় নিজে সেলাই করতেন, নিজের জুতা নিজে সেলাই করতেন। অনেক সময় পারিবারিক কাজ-কর্মও করতেন। তিনি বিনয় ও সরলতার আদর্শ মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি সাধারণের মতো মেঝেতে বসতেন, দেহরক্ষী ব্যতীত বাজারে যেতেন। এমনকি দরিদ্র জনগণ মাঝে মাঝে তাঁকে দাওয়াত দিত এবং তিনি তাদের সাথে আহার করতেন এবং যা-ই দেয়া হতো, তা-ই তিনি কৃতজ্ঞতাভরে ভোজন করতেন। এ গুণের কথাই সূরা, আত তাওবার ৬১ নং আয়াতে বর্ণিত আছে।

"ওহে। তিনি সকলের কথা শোনেন, যে ধরনের ব্যক্তিই তাকে আহ্বান করতেন, তিনি তার আহ্বানে সাড়া দেন।"

একবার উতবা নামে পৌত্তলিক আরবের এক প্রতিনিধি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এসে বলল, "... যদি তুমি নবুওয়াতের দাবি ত্যাগ কর তাহলে আমরা তোমাকে আরব জাহানের নেতা বানাব এবং রাজমুকুট পরিধান করাব। আর আমাদের একটাই দাবি তাহলো তুমি 'এক আল্লাহ' এ কথা পরিত্যাগ কর।" সাথে সাথে রাসূল (সাঃ) এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। পবিত্র কুরআনের সূরা ফুস্‌সিলাত নাযিল হওয়ার পর অনেকবার চেষ্টা করা হয়, বিশেষ করে একবার রাসূলের চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে প্রস্তাব দেয় যে, যদি তিনি ইসলাম প্রচার বন্ধ করেন তাহলে তাঁকে আরব জাহানের সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তিতে পরিণত করা হবে। নবী করীম (সাঃ) বলেন '... হে আমার চাচা! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় তাহলেও আমি মৃত্যু পর্যন্ত আমার প্রচার বন্ধ করব না।" কেন একজন এ ধরনের কষ্ট ভোগ ও ত্যাগের জীবন-যাপন করবেন, যেখানে তিনি তাঁর উপদেষ্টাদের নিয়ে বিজয়ী হতে পারতেন এবং বিজয়ের মুহূর্তে তিনি এতোই বিনয়ী ও মহত্ত্ব ছিলেন যে, তিনি সব সময় বলতেন, এটা মহান আল্লাহর সাহায্য এবং আমার বুদ্ধির জোরে হয়নি।'

কতিপয় প্রাচ্যবিদ নতুন এক তত্ত্ব নিয়ে উপস্থিত হলেন, তাঁরা বললেন, নবী করীম (সাঃ) মাইথমেনিয়া রোগে আক্রান্ত ছিলেন। আল্লাহ না করুন মাইথমেনিয়া হলো মানসিক বৈকল্য, যার দ্বারা মানুষ মিথ্যা বলে এবং ঐ মিথ্যাকে বিশ্বাসও করে। সুতরাং তারা বলছে, আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মিথ্যা বলেছেন (নাউযুবিল্লাহ) এবং তার ওপর বিশ্বাসও করেছেন– যদি কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞ (সাইকিয়্যাট্রিক) মাইথমেনিয়া আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা দিয়ে থাকেন তাহলে তাকে বাস্তবতা দিয়ে হতবুদ্ধি করে। এরা কখনও বাস্তবতার মুখোমুখি হতে সক্ষম নয়। ধরুন, একজন দাবি করল, সে ইংল্যান্ডের রাজা, মনোরোগ চিকিৎসক তাকে বলবেন না যে, সে বিকৃত মস্তিষ্ক, সে পাগল। তিনি তাকে বলবেন, ঠিক আছে যদি তুমি রাজা হয়ে থাক তাহলে কোথায় তোমার রাণী? সে বলবে, সে আমার শ্বশুরালয়ে গিয়েছে। তোমার মন্ত্রী কোথায়? সে বলবে, সে মৃত্যুবরণ করেছে। দেহরক্ষীরা কোথায়? যখন সে বাস্তবতা মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে না, সর্বশেষে রোগী বলবে, আমি ইংল্যাণ্ডের রাজা নই। কুরআন এরূপই করে।

আল-কুরআন মানুষের বাস্তবতা ও প্রশ্নের মাধ্যমে হতবুদ্ধি করে দেয়

আল-কুরআন মানুষের বাস্তবতা ও প্রশ্নের মাধ্যমে হতবাক করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মাইথমেনিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন না বরং ঐ সব ব্যক্তিই মাইথমেনিয়ায় আক্রান্ত, যারা বলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মিথ্যা বলে তা বিশ্বাস করতেন। আল-কুরআন এ ধরনের ব্যক্তিদের বাস্তবতা ও প্রশ্নের মাধ্যমে হতবুদ্ধি করে চিকিৎসা দিয়ে থাকে। যদি তুমি সন্দেহ পোষণ কর, যদি তুমি মনে কর কুরআন মিথ্যা রচনা, তাহলে এরূপ কর। কুরআন আল্লাহর তরফ থেকে নয়, এ ব্যাপারে যাই বলঃ এটা বিভিন্ন প্রশ্ন এসে যায়, যেটা আল্লাহ চাইলে অনেক আলোচনার দাবি রাখে।

কতিপয় ব্যক্তি এ থিওরি নিয়ে এসেছে, যাকে বলে ধর্মীয় মোহ থিওরি বা অর্ধচেতন থিওরি। তাদের মতে, নবী করীম (সাঃ) মানসিকভাবে অর্ধচেতন হতেন এবং কুরআন রচিত হয়েছে অজ্ঞাতসারে। তাদের দাবি তিনি বিকৃত মস্তিষ্ক ছিলেন। আল্লাহ না করুন। আসুন আমরা তাদের উক্তিগুলো ব্যাখ্যা করি।

যদি কোনো মানুষ এ ধরনের মনোরোগে আক্রান্ত হয় বা বিকৃত মস্তিষ্ক হয় তাহলে সে জানতে অক্ষম হবে যে, কুরআন সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নাযিল হয়েছে। কুরআন একসাথে নাযিল হয়নি। এটি ২৩ বছর ধরে খণ্ড খণ্ড করে স্তরে স্তরে নাযিল হয়েছে। তাদের উক্তি অনুযায়ী যদি কুরআন কোনো অর্ধচেতন বা বিকৃত মস্তিষ্ক মন থেকে আসতো তাহলে এতো সুশৃঙ্খলভাবে বজায় থাকত না। একজন লোকের দীর্ঘ ২৩ বছর যাবত নবুওয়াতি মিথ্যা দাবির ওপর থাকা সম্ভব নয়, যেখানে তিনি এ দীর্ঘ সময় অর্ধচেতন থাকবেন।

আল-কুরআনের বিভিন্ন ঘটনা একে মিথ্যা প্রমাণিত করে। আল-কুরআন এমন কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ দেয় যেগুলো ঐ সময়ের কেউ জ্ঞাত ছিল না। কুরআনে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যেগুলো সংঘটিত হয়েছে। বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক সত্য নিহীত রয়েছে, যেগুলো সে সময় পরিচিত ছিল এবং বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ ধরনের বাস্তবতা কোনো অর্ধচেতন অথবা বিকৃত মন থেকে বের হয়ে আসা অসম্ভব। সূরা, আল আরাফে ১৮৪ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۔

অর্থাৎ, তারা কি চিন্তা করে দেখে না যে, তাদের সঙ্গী (মুহাম্মদ) পাগল নয় বরং তিনি হচ্ছেন একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী সৎ পথ প্রদর্শক মাত্র।

সূরা আল-ক্বালাম-এর ২ নং আয়াতে আরোও বর্ণিত আছে وَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۔

অর্থাৎ, আপনার প্রভুর অশেষ মেহেরবাণীতে আপনি তো পাগল নন।

সূরা তাকভীর-এর ২২ নং আয়াত ঘোষণা করা হয়েছে– وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ۔

অর্থাৎ, তোমাদের সাথী পাগল নন।

কেন একজন মিথ্যা বলবেন, তাদের উত্থাপিত সব তত্ত্ব আলোচনায় আনা সম্ভব নয়। যদি কারো নিকট নতুন কোনো থিওরি থেকে থাকে তাহলে আল্লাহ চাইলে আমি প্রশ্নোত্তর পর্বে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করার চেষ্টা করব।

Contents

তাদের আরেক অনুমান হলো মহানবী (সাঃ) এটি অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকে নকল করেছেন অথবা কোন ব্যক্তির উৎস থেকে সংগ্রহ করেছেন। একটি ঐতিহাসিক ঘটনাই এ থিওরিকে ভ্রান্ত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) একাডেমিক নিরক্ষর ছিলেন এবং আল-কুরআনের, আনকাবুত-এর ৪৮নং আয়াতে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ .

অর্থাৎ, আপনি তো এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার আগে কোনো বই পুস্তক পাঠ করেননি; আপনি আপনার ডান হাত দিয়ে কোনো কিছু লিখেননি (যাতে) মিথ্যাবাদীরা সন্দেহে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

ঐ পর্যায়ে হয়তো বিভ্রান্তকারী ব্যক্তিরা সন্দেহ করতে পারতো, আল্লাহ মালুম যে, জনগণ কুরআনের উৎস নিয়ে সন্দেহ পোষণ করবে, এ কারণে তাঁর স্বর্গীয় প্রজ্ঞায় তিনি তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত রাসূল হিসেবে উম্মী, নিরক্ষর ও অশিক্ষিত নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বাছাই করেছিলেন। অন্যথায়, বিভ্রান্তকারী ব্যক্তিরা ফুটপাতের ক্যানভাসারেরা অবশ্যই কিছু বলত, যদি নবী করীম (সাঃ) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষিত হতেন, সমালোচক নিন্দুকদের ভাষায় কিছু ওজন থাকত যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এটি অন্য স্থান হতে সংগ্রহ করে এখানে নতুনভাবে তৈরি ও সংযোজন করেছেন (নাঊযুবিল্লাহ)। এ অভিযোগও সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত।

আল-কুরআন পৃথিবীর মালিকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ

মাছিকে ফাঁকি দেয়া খুবই কঠিন কাজ। তাই ক্বারী আশরাফ মুহাম্মদ পবিত্র কুরআনের ৩২ নং হা-মীম আস সাজদার ১-৩ আয়াতে আল্লাহ বলেন–

অর্থাৎ ঃ আলিফ লাম-মীম। সৃষ্টিকূলের প্রভু মহান আল্লাহ তাআলার তরফ থেকেই এ কিতাবের অবতরণ, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তারা কি একথা বলতে চায় যে, এ কিতাব সে ব্যক্তি রচনা করে নিয়েছে (না) বরং এ হচ্ছে তোমার মালিকের তরফ থেকে (নাযিল করা) একটি সত্য (কিতাব), যাতে এর দ্বারা তুমি এমন এক জাতিকে সাবধান করতে পারো, যাদের কাছে (নিকট অতীতে) তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি।

আল-কুরআন অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের মতো নয়, যাতে কোন ব্যক্তির রচিত গল্পের বই-এর মতো বর্ণধারা সংযুক্ত। গল্পের বই কিভাবে শুরু হয়? এভাবে "কোনো এক সময়ে।"

শেয়াল এবং আঙ্গুর, নেকড়ে এবং খরগোশ। অনুরূপভাবে যদি আপনি অন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন, প্রারম্ভে বলবেন, একজন খোদা ছিলেন, তিনি স্বর্গ এবং মর্ত্য সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে ঐ শব্দ ছিল। হয়তো এখন বলা হতো, যা এসেছিল যেন ঘটেছিল এমন। কুরআনের এরূপ মানবীয় ঘটনা নেই যেমন প্রারম্ভে এরূপ ছিল। যদি আপনি অন্য ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন তাহলে অনুধাবন করবেন, মানবীয় বর্ণনার ধারাবাহিকতা রয়েছে। এটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, তার পরিবার, তার সন্তানদের এভাবে চলতে থাকে, অধ্যায়-১, অধ্যায়-২, ধারাবাহিকভাবে। আল-কুরআনও ব্যক্তি এবং তাদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করে, কিন্তু সাধারণ গল্পের বই-এর মতো ধারাবাহিকভাবে নয়।

আল-কুরআন মানব রচিত এবং প্রতারণা মানুষ তা প্রমাণ করতে সক্ষম নয়

আল-কুরআনের নিজস্ব রূপরেখা রয়েছে। এটা একক মহাগ্রন্থ। কোন ব্যক্তি প্রমাণ করতে পারে না যে আল-কুরআন মানুষের হাতে রচিত। তারা অভিযোগ করে আল-কুরআন হলো চাতুর্যপূর্ণ ও প্রতারণা। যদিও তারা

আল-কুরআনের কোনো একটি স্থানে প্রতারণার একটি স্থানও দেখাতে পারেনি, তারা এমন জিনিসে বিশ্বাস করে, যে সম্পর্কে কোনো প্রমাণ বা কারণ নেই। তারা বোকা বনে যায় কিন্তু এর ওপরই লেগে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, এক ব্যক্তি আমার শত্রু অথচ এর নিকট না আছে প্রমাণ, না আছে কারণ। কিন্তু যখন ব্যক্তিটি আমার সম্মুখে আসে, আমার মিথ্যা বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমি তার সঙ্গে শত্রুর মতো ব্যবহার করি। এর প্রতিক্রিয়ায় সেও আমার সঙ্গে শত্রুর মতো ব্যবহার করে, এতে আমি সন্তুষ্ট হই যে, আমি সঠিক ছিলাম। এ ব্যক্তি আমার শত্রু, কারণ সে আমার শত্রুর মতো ব্যবহার করেছে। যদি আমার পূর্ববর্তী ভ্রান্ত বিশ্বাস না হতো তাহলে সে কখনো আমার সঙ্গে শত্রুর মতো ব্যবহার করতো না। সুতরাং কতিপয় ব্যক্তি কোনো প্রমাণ ও কারণ ব্যতিরেকেই কতিপয় জিনিসে বিশ্বাস করে এবং নিজেকে বোকা বানায় এবং তার ওপরই বহাল থাকে।

আল-কুরআন বলে যে, অহী যুক্তির সাথে সমানভাবে চলে। কতিপয় ব্যক্তি বলে ধর্মগ্রন্থ যুক্তির উর্ধ্বে। সেগুলো যদি যুক্তির উর্ধ্বে হয়, তাহলে কীভাবে বুঝা যাবে কোনো পবিত্র শাস্ত্র বাস্তব আর কোনগুলো অবাস্তব? আল-কুরআন বাস্তবে যুক্তি এবং একইভাবে আলোচনাকে উৎসাহিত করে। কতিপয় মুসলমান অনুধাবন করে যে, আপনাদের ধর্মীয় আলোচনা এড়িয়ে চলা উচিত। আপনাদের ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিতর্ক এড়িয়ে চলা উচিত। সূরা আন নাহল-এর ১২৫ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন।

অর্থাৎ, আপনার প্রভুর পথে মানুষকে হিকমত ও উত্তম যুক্তি দিয়ে ডাকুন, আর বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়।

প্রকৃতপক্ষে কুরআন আলোচনা ও যুক্তিকে উৎসাহিত করে। আশ্চর্যের বিষয় যে, আরবি শব্দ قَالُوا 'তারা বলে' আল-কুরআনে ৩৩২ বার এবং قُلْ 'বল'-ও ৩৩২ বার বর্ণনা করা হয়েছে। এটা প্রমাণিত যে, আল-কুরআন আলোচনাকে উৎসাহিত করে।

'বিকল্প নিঃশেষ কর' নামে পরিচিত একটা থিওরি রয়েছে। কুরআন বলে, এই কিতাব, আল-কুরআন অবতারিত। তা যদি না হয়, তাহলে কী হবে? আপনাকে অন্য বিকল্প দাঁড় করাতে হবে। কেউ বলতে পারে যে এটি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হস্তে বানানো । কিন্তু এটা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। কেউ বলতে পারে তিনি ব্যক্তি স্বার্থে মিথ্যে বলেছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। তাও মিথ্যা প্রমাণিত হলো তারা যে কথাই বলুক না কেন, নিয়ে আসুক এবং পরীক্ষার জন্য দাঁড় করাক; তা কাগজ-কালি, যেখানেই এটা নিশ্চিত হতে হবে এটাকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কুরআন বলে এটি আল্লাহর তরফ থেকে, যদি তা না হয় তাহলে কোত্থেকে?

সূরা জাছিয়া, আয়াত নং ১ ও ২ -এ মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন–

حٰمٓ . تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ .

অর্থাৎ, হামী-ম! পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর তরফ থেকেই এ গ্রন্থের অবতরণ।

আল-কুরআনের বহু জায়গায় বলা হয়েছে যে, এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর তরফ থেকে অবতারিত। নিম্নে সূরা এবং আয়াতের তালিকা প্রদত্ত হলো–

সূরা আল-আনআম, ১৯ নং আয়াত সূরা আল-আনআম, ৯২ নং আয়াত

সূরা ইউসুফ, ১ ও ২ নং আয়াত সূরা ত্বাহা, ২০ নং আয়াত

সূরা ত্বাহা, ১১৩ নং আয়াত সূরা নাহল, ৬ নং আয়াত

সূরা আস্‌সাজদা, ১ ও ৩ নং আয়াত সূরা ইয়াসীন, ১ ও ৩ নং আয়াত

সূরা জুমাআ, ১ নং আয়াত সূরা জাছিয়া, ২ নং আয়াত

সূরা আর-রহমান, ১ ও ২ নং আয়াত সূরা ওয়াকিয়াহ্‌, ৭৭ ও ৮০ নং আয়াত

সূরা আল ইনসান, ২৩ নং আয়াত

বিভিন্ন জায়গায় আল-কুরআন বলে, "এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ, যদি তা না হয় তাহলে কী?"

বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রকম থিওরি উত্থাপন করার পদ্ধতি রয়েছে। যদি কারো নতুন কোনো থিওরি থাকে, তারা বলে আমাদের শোনার সময় নেই এবং ঐ ব্যাপারে তাদের প্রমাণাদি রয়েছে। তারা বলে, যদি তোমার নতুন থিওরি থাকে তাহলে যদি তোমার থিওরি ভ্রান্ত প্রমাণ বা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে আমার নিকট এনো না। আমার নষ্ট করার মতো সময় নেই। একে বলে 'মিথ্যা প্রতিপন্ন' করার পরীক্ষা। একই কারণে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন শতাব্দীর প্রারম্ভে একটি নতুন থিওরি দিলেন যে, মহাবিশ্ব ঐরূপ কাজ করে। এ জন্য তিনি তিনটা মিথ্যা প্রমাণের পরীক্ষাও প্রদান করে বলেন, যদি আপনি মনে করেন আমার থিওরি ভ্রান্ত তাহলে এ তিনটি জিনিস করে দেখান, তাহলে আমার থিওরি ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে। বৈজ্ঞানিকরা এর ওপর ৬ বছর গবেষণা করার পর বলে, হ্যাঁ অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের থিওরি সঠিক। এটা দ্বারা এটা বুঝায় না যে, তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি বরং তিনি শোনাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পবিত্র-কুরআনের বহু স্থানে 'মিথ্যা প্রমাণের পরীক্ষা' রয়েছে। ভবিষ্যতে যখন আপনি কারো সাথে আলোচনায় যান, আপনি তাকে প্রশ্ন করবেন তার ধর্ম মিথ্যা প্রমাণের কোনো পন্থা আছে কি না? বিশ্বাস রাখুন! আমার সাথে এ পর্যন্ত এমন একজনেরও দর্শন মেলেনি যে বলেছে, আমার ধর্ম মিথ্যা প্রমাণের কোনো পন্থা আছে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা প্রমাণের পরীক্ষা রয়েছে। কিছু শুধু অতীতের জন্য ছিল, কিছু সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। আসুন আপনাকে কিছু দৃষ্টান্ত দিয়ে দিই। আবু লাহাব নামে মহানবী (সাঃ)-এর একজন চাচা ছিলেন। যিনি ছিলেন ইসলামের ঘোর বিরোধী। যখনই নবী করীম (সাঃ) কোনো আগন্তুকের সাথে কথা বলতেন, সে চলে যেত এবং রাসূল (সাঃ) তাকে ছেড়ে যাবার সাথে সাথে সে তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করতো মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাকে কী বললো? সে কী বলেছে এটা দিন, এটা রাত, এটা সাদা, এটা কালো? সে নবী করীম (সাঃ) যা বলেছেন, তার ঠিক বিপরীত বলত। আল-কুরআনে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরাই রয়েছে যার নাম লাহাব। যাতে বর্ণিত হয়েছে, 'আবু লাহাব এবং তার স্ত্রী জাহান্নামে ধ্বংস হবে।' এবং এখানে পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে যে, এরা কখনো ইসলাম গ্রহণ করবে না। এ সূরা আবু লাহাবের মৃত্যুর ১০ বছর পূর্বে অবতীর্ণ হয়।

আবু লাহাবের অনেক বন্ধু যারা ইসলামের ঘোরশত্রু ছিল, তারা ইসলাম ধর্মের স্বাদ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সে কবুল করেনি। যেহেতু সে সবসময় মহানবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা চালাতে থাকত, সে একটা জিনিস করতে পারত, সে বলতে পারত, কুরআন মিথ্যা এবং আমি মুসলমান। সে একজন মুসলিমের মতো করতে পারেনি। তার জন্য কুরআনকে ভুল প্রমাণ করা খুবই সহজ ছিল। যেহেতু সে পূর্বেও মিথ্যা বলেছে, সে আরেকটি অতিরিক্ত মিথ্যাও বলতে পারত। নবী করীম (সাঃ) যেন তাঁকে বলছেন, তুমি চিন্তা করো আমি তোমার শত্রু। আসো, এটা বল আমি মুসলিম, তাহলে আমি মিথ্যা প্রমাণিত হব। এটা একেবারেই তার জন্য সহজ ছিল। সে এটা কখনো

বলেনি, এটাই প্রমাণিত হলো যে, কোনো মানবই তার কিতাবের ব্যাপারে এ ধরনের বর্ণনা দেবে না। কারণ এটা আল্লাহর অহী।

এ ধরনের আরেকটি দৃষ্টান্ত সূরা বাকারার ৯৪ ও ৯৫ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

"যদি তোমরা মনে কর আখিরাতের আল্লাহর ঘর শুধুইতো আমাদের জন্য, অন্য লোকদের জন্য নয়, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর। কখনোই তারা তা (মৃত্যু) কামনা করবে না, তাদের হাতের কামাই-এর কারণে। আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে অবগত।"

আয়াতগুলো, ইহুদিরা যখন বলেছিল আখিরাতের ঘর অর্থাৎ জান্নাত একমাত্র তাদের জন্য, তখন ইহুদি ও মুসলমানদের সম্মুখে বিতর্কের সময় উপস্থিত হয়। সুতরাং এ আয়াত একথা বলার জন্য নাযিল হয় যে, যদি তোমরা মনে কর জান্নাত শুধু তোমাদের জন্যই তাহলে তোমরা মৃত্যুকে ডাক মৃত্যু কামনা কর। তখন ইহুদি ব্যক্তি ঐ সময়ে বের হয়ে যদি বলতো আমি মৃত্যু কামনা করি, আমি মরতে চাই। সে করত না। শুধু বলত আমি মরতে চাই। কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য শুধু বলত আমি মরতে চাই। কুরআনকে ভুল প্রমাণ করা সহজ-সাধ্য ছিল। কিন্তু কোনো ইহুদি এগিয়ে এসে বলে নাই আমি মরতে চাই। এটা হলো 'মিথ্যা প্রমাণের পরীক্ষা'।

এখন বলতে পারেন এ সব পরীক্ষা তো অতীতের। এখন আমরা কীভাবে কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে পারি? যদি আপনি কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চান, কুরআনের পরীক্ষা আছে। 'মিথ্যা প্রমাণের পরীক্ষা' এগুলো সব সময়ের জন্য। ঐ সময়ের জন্য, বর্তমানের জন্য এবং সর্বকালের জন্য। কুরআন বলে, কতিপয় ব্যক্তি দাবি করে যে কুরআন মিথ্যা ছিল সূরা বনি ইসরাঈল আয়াত নং ৮৮-এ বর্ণিত আছে।

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۔

অর্থাৎ, তাদের বলো, যদি মানুষ ও জিন মিলে কুরআনের অনুরূপ একটি কিতাব রচনা করতে চায়, তাহলে তারা তা পারবে না, যদি এ ব্যাপারে তারা একে-অপরের সাহায্যকারীও হয়। এটা তাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ। সূরা বনি ইসরাঈল : ৮৮

আল-কুরআনকে মুসলমান ও বিধর্মী নির্বিশেষে প্রত্যেকেই পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম আরবি সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আল-কুরআনের আরবি ভাষা খুবই স্বচ্ছ, অর্থবহ, বোধগম্য, দ্ব্যর্থহীন ও অলৌকিক। এটি কাউকে সত্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়না। এমনকি এর কাব্য সাধারণ কবিতা ও সাহিত্যের মতো নয়, এটা অহীর সর্বোচ্চ কাব্যিক ও ছান্দিক। কুরআনের একই আয়াত একজন সাধারণ ও অসাধারণ মানুষকে বুঝাতে সক্ষম। একই চ্যালেঞ্জ সূরা আত-তুরের ৩৪ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۔

অর্থাৎ, যদি তারা সত্যবাদী হয় তাহলে তারাও এর মতো একটা বাণী রচনা করে নিয়ে আসুক।

এরপর এ চ্যালেঞ্জকে আরো সহজ করে উত্থাপন করা হয়েছে সূরা হুদ-এর ১৩ নং আয়াতে–

অর্থাৎ, তারা কি বলে, মুহাম্মদ কুরআন নিজে রচনা করে নিয়ে এসেছে? আপনি বলুন! তোমরা স্বরচিত মাত্র

দশটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসো, আর আল্লাহ ব্যতীত যারা আছে তাদের সাহায্যের জন্য ডেকে নিয়ে আসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

এ দশ সূরাও তারা রচনা করতে পারেনি। আল্লাহ এ পরীক্ষা আরো সহজ করে সূরা ইউনুসের ৩৮ নং আয়াত বর্ণিত আছে–

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ .

অর্থাৎ, তারা কি বলে ইনি মুহাম্মদ (সাঃ) এটি রচনা করে নিয়ে এসেছেন। আপনি বলুন, তোমরা এমন একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ব্যতীত আর যে সাহায্যকারী পাও তাকে ডাকো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

আরোও সবচেয়ে সহজ পরীক্ষা দিয়েছেন। সবচেয়ে সহজতম মিথ্যা প্রমাণের পরীক্ষা সূরা বাকারার ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, আমার বান্দার প্রতি আমি যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি তার সত্যতার ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে যাও– সেই (একটি) সূরার মতো অন্য একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস। আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের যেসব বন্ধু-বান্ধব রয়েছে, তাদেরকেও আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি তোমরা না পার, প্রকৃত পক্ষে তোমরা কখনও পারবে না সুতরাং সেই অগ্নিকে ভয় কর যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর– যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত।

প্রথমত, আল-কুরআন-এর অনুরূপ আবৃত্তি পেশ করার চ্যালেঞ্জ দেয়। আল্লাহ আরেকটু সাধারণ করে আল-কুরআনের ১০টি সূরার সমান রচনা করতে বলেন। এরপর একটি সূরা। এখানে বলছে একটি সূরার অনুরূপ مِنْ مِّثْلِهِ (মিম মিছলিহি) অন্যস্থানে আল কুরআন বলেছে مِثْلِهِ। এখানে مِنْ مِّثْلِهِ বলে প্রায় অনুরূপ বুঝানো হয়েছে এবং আরবের বিধর্মীরা এটা করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কুরআন যখন অবতীর্ণ হয়, তখন আরবি সাহিত্য সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করছিল। অনেক পৌত্তলিক আরব চেষ্টা করেও পারেনি। তাদের কিছু কাজ ঐতিহাসিক গ্রন্থে এখনো বিদ্যমান, যেটা তাদেরকে হাস্যম্পদ করে রেখেছে। যদিও এ চ্যালেঞ্জ ১৪০০ বছর পূর্বের, তবুও এটা এখনো বহাল আছে।"

বর্তমানে ১৪ মিলিয়নের অধিক খ্রিস্টান রয়েছে, যারা জন্মসূত্রে আরবে বাস করে। আরবি তাদের মাতৃভাষা। এ পরীক্ষা তাদের জন্যেও। এখনো যদি তারা কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চায়, তাহলে একটি জিনিসই তাদের করতে হবে তাহলো একটা সূরার মতো একটা অংশ তৈরি করা। আর যদি আপনি নির্দিষ্ট সূরা বর্ণনা করেন, নির্দিষ্ট অধ্যায় যাতে মাত্র কয়েকটি শব্দ রয়েছে। তারপরে এ কাজ করতে কেউ সক্ষম হয়নি এবং হবেও না ইনশাআল্লাহ। আপনি আমাকে বলবেন, আরবি আমার মাতৃভাষা নয়। সুতরাং এ পরীক্ষার আমি উপযুক্ত নই। সবার সদয় জানার জন্য বলছি আল-কুরআনে অনারবিদের জন্যও পরীক্ষা রয়েছে। ঐ সব ব্যক্তি, যারা আরবি জানে না, যদি তারা কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চায়, তারাও চেষ্টা করতে পারে। আমি পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করেছিলাম। বলা হচ্ছে–

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ـ

অর্থাৎ, এরা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না? এ গ্রন্থ যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে আসতো, তাহলে তারা অবশ্য এর মধ্যে অনেক গরমিল পেতো।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যদি তুমি কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চাও তাহলে শুধু একটা বৈপরীত্য, একটা গরমিল বের কর। একাজটিও অতি সহজ। শত শত ব্যক্তি কুরআনের ভুল এবং বৈপরীত্য ধরার চেষ্টা লিপ্ত রয়েছে। বিশ্বাস করুন, তাদের ১০০% হয়তো মূল গ্রন্থের বাইরের, যেমন তারা ভুল উদ্ধৃতি বা ভুল অনুবাদ দিয়েছে জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য। এখনো কোনো ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের একটা বৈপরীত্য বা ভুল প্রমাণ করতে পারেনি।

কুরআনের কোনো ভুল ত্রুটি কেউ খুঁজে বের করে দেখাতে পারবে না।

একজন মাওলানা ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ, কিন্তু বিজ্ঞানের জ্ঞানে অনভিজ্ঞ আমি এমন অনেক মাওলানাদের সম্পর্কে জানি যারা ইসলাম এবং বিজ্ঞান উভয় বিষয় সম্পর্কে ভালো জানেন। মনে করুন, অন্য একজন মাওলানা যিনি ইসলামের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ভালো জানেন কিন্তু বিজ্ঞানে ভালো জ্ঞান নেই। আপনি তাঁর নিকট গেলেন এবং বললেন, কুরআনে একটি বৈজ্ঞানিক ভুল আছে। তিনি কুরআনের বৈজ্ঞানিক ভুলের বিষয়টি পরিষ্কার করতে সক্ষম হবেন না। এতে বুঝা যায় না যে, কুরআন আল্লাহর বাণী নয়। সূরা ফুরকানের ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন— اَلرَّحْمٰنُ فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِيْرًا ـ

অর্থাৎ, দয়াময় রহমান সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস কর, যে ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে অবগত।

যদি আপনি আল-কুরআন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে চান্ এবং এতে যদি বৈজ্ঞানিক বিষয় থাকে, তাহলে একজন বিজ্ঞানী-ই পরিষ্কার করতে পারবেন কুরআনের সেই ব্যাখ্যা। একইভাবে শ্রোতাদের নিকট থেকে কেউ কুরআনের ব্যাকরণগত ভুল যদি প্রমাণ করে। আমি আরবিতে পারদর্শী নই আমি একজন মাত্র শিক্ষার্থী এবং আমি আরবির ভুল সংশোধন করতে পারি না।

আমি এ বিজ্ঞানের বিষয়টা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবো, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আমি আরবির ভুল সংশোধন করতে পারবো না। কেউ-ই পবিত্র-কুরআনের ভুল নির্ণয় করতে পারেনি এবং ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না। কেননা, কুরআন সকল ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে।

এ যৌক্তিক ব্যাখ্যার পর কোনো ব্যক্তি যে আল্লাহ-য় বিশ্বাসী, সে বলতে পারে না যে, কুরআন আল্লাহর তরফ থেকে আসেনি। যদি কোনো লোক সর্বশক্তিমান আল্লাহকে বিশ্বাস না করে, সে অন্যরকম বলবে। কিন্তু একজন অমুসলিম যে আল্লাহ-য় বিশ্বাস করে, এসব প্রমাণ পাওয়ার পর, সে বলতে পারে না যে, এটি আল্লাহর তরফ থেকে নয়।

এখন একমাত্র তৃতীয় মৌলিক অনুমানই বাকি থাকল যে, এর মূল স্বর্গীয়। এটি আল্লাহর তরফ থেকে, তাদের জন্য বলছি, যারা আল্লাহ-য় বিশ্বাস করে না, নাস্তিক। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি সে সব নাস্তিকদের, যারা এখানে উপস্থিত আছেন। আমার বিশেষ অভিনন্দন নাস্তিকদের জন্য, কারণ তারা নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে। তারা তাদের যুক্তির শক্তিকে ব্যবহার করে। আল্লাহ-য় বিশ্বাসী অধিকাংশ ব্যক্তিই অন্ধ বিশ্বাসী। সে খ্রিষ্টান কারণ

Contents

তার পিতা একজন খ্রিষ্টান, সে একজন হিন্দু, কারণ তার পিতা একজন হিন্দু, সে মুসলমান, যেহেতু তাদের পিতা-মাতা মুসলমান। তারা অন্ধ বিশ্বাসী।

নাস্তিকরা অন্তত বলে 'লা ইলাহা' – কোনো আল্লাহ নেই।

একজন নাস্তিকের ধর্মীয় ঐতিহ্য ছিল। অথবা ধর্মীয় পরিবার, তথাপি সে চিন্তা করল যে তার চতুর্দিকের মানুষ কীভাবে এমন আল্লাহর ইবাদত করে, যার গুণাবলি একজন মানুষের মতোই, এটা কী করে সম্ভব? তারপর নিজেকে জিজ্ঞেস করে আমি কীভাবে এরূপ আল্লাহর পূজা করব? সুতরাং সে বলে কোনো আল্লাহ নেই। সে আল্লাহর অস্তিত্বের ধারণা বাতিল করে দেয়। কতিপয় মুসলিম আমাকে বলতে পারেন, জাকির সাহেব, আপনি কীভাবে একজন নাস্তিককে অভিনন্দন জানাচ্ছেন? আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এজন্য যে, সে কালিমা শাহাদাতের প্রথম অংশ ইসলামে প্রবেশের প্রথম অংশ লা-ইলাহা "নেই কোন মাবুদ" এটুকু পড়েছে। এখন শুধু বাকি থাকল 'ইল্লাল্লাহ" "আল্লাহ ছাড়া"। সে অংশ আমরা পূরণ করব ইনশা-আল্লাহ। সে শাহাদাত-এর প্রথম অংশ "নেই কোনো আল্লাহ"কে মেনে নিয়েছে। অর্থাৎ সে এমন আল্লাহকে মানে না, যার মধ্যে মানবীয় গুণাবলি বিদ্যমান। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো তার নিকট সত্যিকার আল্লাহর (অস্তিত্বের) প্রমাণ উথাপন করা।

যে মুহূর্তে একজন নাস্তিক বলে যে, আমি কোনো আল্লাহ বিশ্বাস করি না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করব "আল্লাহ" এর সংজ্ঞা কী? আপনি গড দ্বারা কী বুঝাতে চান এবং তাকে উত্তর দিতে হবে। আপনারা কি জানেন? মনে করুন আমি বললাম, এটা একটা কলম। আপনি বললেন, এটা কলম নয়, আপনাকে "না" বলার জন্য জানতে হবে কলম কী জিনিস। কলমের অর্থ কী? আপনাকে কলমের সংজ্ঞা জানতে হবে। আপনি নাও জানতে পারেন এটা কী? কিন্তু আমি যদি বলি এটা কলম আর আপনি যদি বলেন কলম নয়, তাহলে কমপক্ষে আপনাকে কলমের অর্থ জানতে হবে। একই পন্থায় যদি কোনো নাস্তিক বলে "কোনো আল্লাহ নেই" তাকে জানতে হবে "আল্লাহ" মানে কী? এবং নাস্তিকেরা আমাকে বলবে দেখুন আমার চারপাশের লোকেরা পূজা করে এবং তারা যে সৃষ্টির উপাসনা করে, তা তাদের হাতের তৈরি। তাদের মানবিক বৈশিষ্ট্য আছে। অতএব, আমি এ ধরনের সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস করি না। কেননা, সৃষ্টির যে ধারণা এ লোকদের আছে তা ভুল ধারণা। যেহেতু আপনি ভ্রান্ত ধারণা বাতিল করেছেন, আমি মুসলমান হিসেবেও আল্লাহর ভ্রান্ত ধারণা বাতিল করছি "লা ইলাহা"। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি তার সাথে একমত, সে মুহূর্তে আমি তাকে আল্লাহর সত্য ধারণা দান করব।

আমাদেরই কর্তব্য আল্লাহর সঠিক ধারণা ঠিক করে দেয়া

একজন অমুসলিম বিশ্বাস করে যে, ইসলাম মূল্যহীন ধর্ম। এটা একটা নির্দয় ধর্ম, যা সন্ত্রাসের সাথে জড়িত, এটা এমন একটা ধর্ম, যা নারীদের অধিকার প্রদান করেনি। এটা এমন একটা ধর্ম যা চলমান বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক। একথা বলে যদি সে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আমিও বলব, আমিও এ ধরনের মূল্যহীন ও কঠোর ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করব, যা নারীদের অধিকার প্রদান করে, যা অবৈজ্ঞানিক। একই সময়ে আমার দায়িত্ব হলো তাকে ইসলাম ধর্মের ধারণা সংশোধন করে দেয়া, তাকে বলতে হবে ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা দয়াপূর্ণ, সন্ত্রাসের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ইহা নারীদের সমঅধিকার প্রদান করে। এটি বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক তো নয়ই বরং সহযোগিতাপূর্ণ। এরপর আল্লাহ চাইলে এ অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। আমাদের দায়িত্ব হলো ধারণা সঠিক করে দেয়া। একইভাবে আমাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ সম্পর্কে ধারণাটাও মস্তিষ্কে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

আল্লাহ তাআলার সর্বোত্তম সংজ্ঞা পবিত্র কুরআনের সূরা ইখলাছ থেকে আপনাকে দিতে চাই। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন– اَللّٰهُ الصَّمَدُ আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও চিরঞ্জীব لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কারো থেকে জন্ম গ্রহণও করেন নি وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ . তাঁর কোনো সমকক্ষও কেউ নেই।

ব্যাখ্যা

প্রথম অংশ ঃ তিনি সেই সত্তা, যিনি অন্যদের সাহায্য করেন, তাঁর কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয় অংশ ঃ পৃথিবীতে তার সঙ্গে তুলনা করার মতো কোন বস্তু নেই। যখনই আপনারা আল্লাহকে কারোর সাথে তুলনা করবেন, তিনি আল্লাহ নন। যদি আপনি বা কেউ সর্বশক্তিমান কোনো গডকে আল্লাহ বলতে বলেন, তার মধ্যে এ চারটি লাইনের সংজ্ঞা রয়েছে, আমাদের মুসলমানদের তাঁকে সর্বশক্তিমান হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকবে না।

যদি রজনীশ আল্লাহ হতেন তাহলে তিনি তার অ্যাজমা ও ডায়াবেটিস নিরাময় করতে পারতেন

তাকে আল্লাহ হিসেবে গ্রহণ করতে কি... আপনাদের দাবিদার কারা, দাবিদারদের এক এক করে নিয়ে আসুন। কেউ বলতে পারে 'ভগবান রজনীশ অশো হলেন সর্বশক্তিমান খোদা।' আসুন আমরা তাকে পরীক্ষা করে দেখি। প্রথম পদ্ধতি হলো : বলুন আল্লাহ এক ও একক। কিন্তু রজনীশের মতো আমাদের অনেক ব্যক্তি রয়েছে। আমাদের দেশে তাদের সংখ্যা অনেক। এরপরও রনজীশের অনুসারীরা বলবে না, রজনীশ একক, সে এক। তাকে প্রথম পরীক্ষায় পাশ করতে দিন (ধরে নিন সে পাশ করল)। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো: "আল্লাহ হলেন নিরঙ্কুশ ও চিরস্থায়ী।" তার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। তিনি অন্য লোকদের সাহায্য করেন। আমরা রজনীশকে ভালোই চিনি। তিনি অ্যাজমা ও ডায়বেটিসের মতো জটিল রোগে আক্রান্ত। তিনি নিজের রোগের নিরাময় করতে সক্ষম নহে। তিনি কীভাবে অন্যদের তথা আমার রোগের নিরাময় করবেন?

রজনীশ যদি আল্লাহ হতেন তাহলে তিনি গ্রেফতার হতেন না, তাকে বিষ প্রয়োগ করা যেত না

যখন রজনীশ আমেরিকা গিয়েছিলেন, তখন তিনি আমেরিকা সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হন। ভেবে দেখুন! আল্লাহ গ্রেফতার হলেন। তিনি নিজকে মুক্ত করতে পারলেন না, তাহলে আমরা সমস্যায় পড়লে তিনি কীভাবে মুক্ত করবেন? এরপর তিনি বিবৃতি দিলেন, তারা তাকে বিষ প্রয়োগ করেছেন, ধীর গতির বিষ।

ভেবে দেখুন! আল্লাহ কি গ্রেফতার হতে পারেন। তাকে পরীক্ষা করুন। গ্রিসের আর্চ বিশপ বলেছিলেন, যদি আপনারা আল্লাহ দাবিদার রজনীশকে বহিষ্কার না করেন, তাহলে আমরা তাঁর এবং তার শিষ্যদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করব। ফলে রাষ্ট্রপতি তাকে গ্রিস থেকে বহিষ্কার করেন। তিনি কি তাহলে নিরঙ্কুশ ও চিরস্থায়ী?

তৃতীয় অংশ ঃ তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম গ্রহণও করেননি। আমি জানি না রজনীশের কত জন সন্তান ছিল, কিন্তু আমি জানি তার একজন মা এবং একজন বাপ ছিলেন। তিনি ১৯৩১ সালের ১১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আপনি যখন তার সেন্টার পুনে যাবেন, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে ভগবান রজনীশ কখনো জন্মলাভ করেননি, কখনো মারা যাননি; বরং ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ থেকে ১৯ জানুয়ারি ১৯৯০ পর্যন্ত বিশ্বভূমণ্ডল দর্শন করেছিলেন। তারা উল্লেখ করেনি যে, তিনি একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বভূমণ্ডল দর্শন করার

অনুমতি প্রাপ্ত ছিলেন না। তাকে ভিসা প্রদান করা হয়নি। তিনি চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাকে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। এবার বুঝুন! ভগবান পৃথিবী দর্শন করছেন; কিন্তু একবিংশ শতাব্দী দর্শন করতে সক্ষম ছিলেন না। এ আল্লাহর কি আপনি বিশ্বাস স্থাপন করবেন?

আল্লাহ অতুলনীয়

সর্বশেষ পরীক্ষা হলো, "এ পৃথিবীতে তার সমকক্ষ কেউ নেই।" তার সাথে তুলনীয় কোন বস্তু নেই। যখন আপনি আল্লাহ কী? এ চিন্তা করবেন, তখন আল্লাহ নয় এমন একটা আকৃতি আপনি মনে আঁকবেন। আমরা ভালোই জানি যে, রজনীশের বড় চুল, বড় লম্বা দাড়ি, যার রং ছিল সাদা। গাউন পরতেন। যখনই আপনি চিন্তা করবেন এবং আল্লাহর ছবি মনে আঁকতে পারবেন, তিনি আল্লাহ নন। যদি আপনি ধরে নিয়ে বলেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলিউড অভিনেতা আরনল্ড সুয়ার্জনেগার-এর চেয়ে এক হাজার গুণ শক্তিশালী। আপনি কি জানেন আরনল্ড সুয়ার্জনেগার কে? তিনি মিস্টার ইউনিভার্স হিসেবে উপাধি লাভ করেছিলেন। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী লোক, যদি আপনি বলেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরনল্ড সুয়ার্জনেগার অথবা দারা সিং কিংবা কিংকং-এর চেয়ে এক হাজার গুণ শক্তিশালী, তাহলে তিনি আল্লাহ নন। যে মুহূর্তে আপনি তাকে কারোর সাথে তুলনা করবেন, তা এক হাজার গুণ, এক মিলিয়ন গুণ অথবা দশ মিলিয়ন গুণ, যখনই আপনি তাকে কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করবেন তাহলে তিনি আল্লাহ নন। পৃথিবীতে তার সমকক্ষ কিছুই নেই।

আমি বিশিষ্ট এবং বিদ্বান সম্মানীত শ্রোতৃমণ্ডলিকে নিজেদের ভেতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ভার ছেড়ে দিব যে, কোন্ ধরনের আল্লাহর ইবাদত তারা করবেন। তাদের সৃষ্টিকর্তাকে আল্লাহ কুরআনে বর্ণিত চার পরীক্ষা নিন। যদি এ পুজনীয় এর চার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, আমাদের মুসলমানদেরও এতে আপত্তি নেই যে, আমরা তাঁকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ হিসেবে গ্রহণ করব। অন্যথায় আপনার সিদ্ধান্ত আপনি নিন। এ পরীক্ষাগুলোর পরে কিছু নাস্তিক হয়তো এ ধরনের আল্লাহর বিশ্বাস করতে পারেন।

কিন্তু অধিকাংশ নাস্তিক এতে একমত হবে না। তারা বলবে আমরা এ ধরনের সংজ্ঞায় বিশ্বাস করিনা, বরং আমরা অন্য কিছুতে বিশ্বাস করি। আমরা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি। আমি একমত যে, আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। সুতরাং আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড কাজে লাগাই। আসুন আমরা একে কুরআনের আলোকে প্রয়োগ করি। সুতরাং আমরা এ ধরনের প্রভুকে বিশ্বাস করিনা, আল্লাহর অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে প্রমাণ করুন। তারপরই আমরা এতে বিশ্বাস করব।

সর্বপ্রথমে আমি এ ধরনের নাস্তিক বা আল্লাহর অবিশ্বাসী কোনো শিক্ষিত ব্যক্তিকে একটি প্রশ্ন করতে চাই, যিনি শুধু বিজ্ঞানেই বিশ্বাসী। আপনি কি আমাকে ঐ প্রথম ব্যক্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন, যিনি অজানা বস্তুর গঠন সম্পর্কে বলতে সক্ষম? এ বিশ্বের কেউ শোনেনি, দেখেও নি। এখন এ মেশিন ঐ নাস্তিকের সম্মুখে অথবা ঐ শিক্ষিত ব্যক্তির সম্মুখে যিনি এ অপরিচিত বস্তুর গঠন সম্পর্কে বলতে সক্ষম তার সম্মুখে আনা হলো। আমি এ প্রশ্ন শত শত নাস্তিককে জিজ্ঞেস করেছি। সামান্য একটু চিন্তা করার পর সে উত্তর দেয়া হতে পারে যে স্রষ্টা, যিনি বস্তুটি সৃষ্টি করেছেন, কেউ বলতে পারে আবিষ্কারক। কেউ ম্যানুফ্যাকচারার অথবা উৎপাদনকারীও বলতে পারে। বিশ্বাস করুন তারা যাই বলুক, তা প্রায় একই।

আল কুরআনের বহু স্থানে পানিচক্র সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে

আল কুরআন বহুজায়গায় পানিচক্র সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যা আবিষ্কৃত হয় ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে বার্নার্ড প্যালাসি কর্তৃক। মাত্র এই ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান সামঞ্জস্যশীল পানিচক্র আবিষ্কৃত হয়। কুরআনে কে ১৪০০ বছর পূর্বে এটা উল্লেখ করেছেন?

নাস্তিক ব্যক্তিটি আপনাকে শুনাবে ভূ-বিদ্যার ক্ষেত্রে 'ভাঁজ' পড়াজনিত একটা ঘটনা পরিচিত আছে। যে ভূমণ্ডলে আমরা বসবাস করি, এ ভূমণ্ডলের আবরণ খুবই পাতলা। এ সব পর্বতশ্রেণী 'ভাঁজ' ঘটিত ঘটনায় পৃথিবীকে কম্পন থেকে রক্ষা করে। এটি পৃথিবীকে স্থির রাখে। আমি তাকে বললাম কুরআন এটি সূরা নাবা'য় ৬ ও ৭ নং আয়াতে এভাবে বর্ণিত আছে–

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۔ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۔

অর্থাৎ, আমি কি ভূমিকে বিছানার মতো ও পাহাড়সমূহকে পেরেকের মতো গেঁথে রাখিনি?

পবিত্র কুরআন বলছে যে, পাহাড়গুলোকে পেরেকের মতো গঠন করা হয়েছে। এটা হলো সেই বর্ণনা, যা আজকের বিজ্ঞানীরা কীলকের মতো করে দিচ্ছেন। পর্বতগুলো হলো মূল পেরেক। আল-কুরআনের সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত আছে,

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۔

অর্থাৎ, আমি জমিনের ওপর সুদৃঢ় পাহাড়সমূহকে গেড়ে রেখে দিয়েছি যেন তা ওদের নিয়ে এদিক-ওদিক নড়াচড়া করতে না পারে।

নাস্তিক ব্যক্তিটি আমাদের আরো শুনাবে যে, এমনকি লবণাক্ত পানি ও মিঠা পানি যদিও পরস্পর মিলিত হয় তবুও মিশ্রিত হবে না। সেগুলো পৃথক থাকবে। আমি তাকে আল-কুরআনের সূরা ফুরকানের ৫৩ নং আয়াতের দিকনির্দেশনা দিলাম, এতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, তিনি আল্লাহ যিনি দুই প্রকারের পানির স্রোতধারা তৈরি করেছেন। একটি ধারা মিষ্ট সুপেয় অপরটি লবণাক্ত ক্ষার এবং উভয়ের মাঝে তিনি (আল্লাহ) একটি সীমারেখা দিয়ে দিয়েছেন, যা অনতিক্রম্য।

অনুরূপ ঘটনা উল্লেখ রয়েছে, সূরা আর রাহমানের ১৯ ও ২০নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

"তিনি দুটি স্রোতধারাকে প্রবাহিত করেছেন, যার মধ্যখানে হলো একটি অন্তরাল, যার বাধা অনতিক্রম্য সুতরাং আপনি কোন্ বিষয়কে অস্বীকার করবেন?"

বর্তমান বিজ্ঞান বলছে যে, লবণাক্ত পানি ও মিষ্টি পানি সংমিশ্রণ হয় না। এ দুয়ের মাঝে রয়েছে একটি বাধা। নাস্তিক সে বলতে পারে যে, কিছু আরব হয়তো পানির নিচে গিয়ে বাধা দেখে এসেছে এবং এরূপ কুরআনে উল্লেখ করেছে। তারা এটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে, এ বাধাটি অদৃশ্য। আল-কুরআনে بَرْزَخٌ (বারযাখ) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ অদৃশ্য বাধা। এবং এ ধরনের ঘটনা দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে অনেক সময় দেখা যায়। কেপ টাউন হলো দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব দক্ষিণের অগ্রভাগ। এটা মিসরেও দেখা যায়, যখন ভূমধ্যসাগরের মধ্যে নীল নদ প্রবাহিত হয়। যে উত্তরই তারা দেয়, আমি মেনে নিই, আমি শুধু মনে রাখি। এটা প্রায় একই হবে।

আরবিতে يُوْلِجُ শব্দ রয়েছে। যার অর্থ ধীরে এবং পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন। রাত ধীরে ধীরে এবং পর্যায়ক্রমে দিনে পরিবর্তিত হয়, এবং দিন ধীরে ধীরে আর পর্যায়ক্রমে রাতে পরিণত হয়। সুতরাং পৃথিবী চ্যাপ্টা হলে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে না। যদি পৃথিবী গোলাকার হয় তবেই শুধু এ ধরনের ধীর পরিবর্তন সম্ভব।

একই ধরনের সংবাদ সূরা যুমারের ৫ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, তিনি রাতকে দিনের পর লেপ্টে দেন, আবার দিনকে রাতের সাথে লেপ্টে দেন।

লেপ্টে দেয়া এবং পেঁচানো যেমন মাথায় পাগড়ি পেঁচানো, এধরনের পরিবর্তন শুধু এ সময় সম্ভব, যখন পৃথিবী গোলাকার হবে। পৃথিবী চ্যাপ্টা হলে এটা সম্ভব নয়। আপনি বলছেন, এটা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে? আপনি কি হিসাব করতে পারেন কে এটি কুরআনে ১৪০০ বছর পূর্বে বলে গিয়েছিলেন? হতে পারে এটা একটা ভালো অনুমান, কিন্তু এটা অনুমান। আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করি না, এগিয়ে যাই।

কুরআন উল্লেখ করে যে, চাঁদের আলো প্রতিবিম্ব (নিজস্ব নয়)

চাঁদ থেকে যে আলো আসে তা কোত্থেকে আসে? এ প্রশ্নের উত্তরে সে বলবে, পূর্বে লোকেরা মনে করতো চাঁদের নিজস্ব আলো ছিল। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তারা জানতে পেরেছে যে, চাঁদের আলো তার নিজের আলো নয় বরং এটা সূর্যের প্রতিবিম্বের আলো। আমি তাকে প্রশ্ন করি যে, সূরা ফুরকানের ৬১ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন–

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاۤءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ـ

অর্থাৎ, বরকতময় সেই সত্তা, যিনি আসমানে অসংখ্য বুরুজ (নক্ষত্রপুঞ্জ বা কক্ষপথ) তৈরি করেছেন। আর আসমানে স্থাপন করেছেন উজ্জ্বল আলোকপিণ্ড (সূর্যকে) এবং প্রতিবিম্বিত আলোর অধিকারী চাঁদকে স্থাপন করেছেন।

চাঁদের আরবি শব্দ হলো قَمَرًا (কামার) এবং এখানে আলো বলতে مُنِيْرًا (মুনীর) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'মুনীর' হলো ধার করা আলো, نُوْر (নূর) হলো আলোর প্রতিবিম্ব। আল কুরআন বলছে যে, চাঁদের আলো হলো কীভাবে? সে কিছু সময়ের জন্য থেমে যাবে। সে তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দিবে না। এরপর সে হয়তো বলতে পারে, এটা অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি। আলোচনার স্বার্থে আমি তার সঙ্গে তর্ক করি না। আমি বলি, যদি তুমি একে অনুমান বলো, তাহলে আমি বিতর্ক করব না।

আসুন আমরা এগিয়ে যাই। আমি তাকে বলব, আমি ১৯৮২ সাল মেট্রিক (এসএসসি) পাস করি। আমি পড়েছি যে, সূর্য স্থির। এটা আবর্তিত হয়, কিন্তু এক স্থানে থেকে নিজ কক্ষ পথে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, কুরআনও কি একথা বলে? আমি বলি না। এটা আমি স্কুলে শিখেছি, সত্য নয় কি? সে বলে না। আজ বিজ্ঞান অগ্রসর। সম্প্রতি আমরা জানতে পেরেছি যে, সূর্য আবর্তিতও হয় আবার চলেও। এটা স্থায়ী নয়। এটা তার নিজস্ব কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করছে, যদি আপনার যন্ত্র থাকে তাহলে আপনি সূর্যকে টেবিলের ওপর ধরতে পারবেন।

সূর্যের কালো দাগ রয়েছে এবং এক চক্র পূরণ করতে এ কালো দাগের কারণে ২৫ দিন লাগে। কুরআন কি বলেছে এটি একস্থানে থাকে? সে হাসতে শুরু করল। আমি বললাম, না। আল-কুরআনের সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.

অর্থাৎ, তিনি সেই সত্তা, যিনি রাত, দিন, চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।

তুমি আমাকে বলো, যে বৈজ্ঞানিক সত্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত হলো তা কে কুরআনে উল্লেখ করে রেখেছেন? সে নীরব থাকে, দীর্ঘ বিরতির পর সে জবাব দিবে যে, আরবিরা জ্যোতির্বিদ্যায় অনেক অগ্রগামী ছিল। সুতরাং হয়তো কোনো আরব তোমার রাসূলকে এ সম্পর্কে বলেছিল, তাই তিনি কুরআনে উল্লেখ করে দিয়েছেন।

আমি একমত যে আরবরা জ্যোতির্বিদ্যায় অনেক অগ্রগামী ছিলেন। কিন্তু আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, তার দিনগুলো খুবই পুরনো। আরবেরা জ্যোতির্বিদ্যায় অগ্রসর হবার বহু শতাব্দী পূর্বেই কুরআন নাযিল হয়েছিল। অতএব কুরআন থেকেই আরবরা জ্যোতির্বিদ্যা লাভ করেছিল। এটা একই সময়ে আদান-প্রদান হয়নি। এভাবে কুরআন অনেক বৈজ্ঞানিক সত্যের উল্লেখ করেছে।

আল-কুরআনে ভূগোল ও পানিচক্র

কুরআন ভূগোল এবং পানিচক্র সম্পর্কে বর্ণিত আছে সূরা যুমার ২১ নং আয়াতে–

অর্থাৎ, তুমি কি দেখনি নিশ্চয় মহান আল্লাহ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষন করেন, অতঃপর এটি তাঁর উৎস মাটিতে নেমে আসে এবং এর দ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন।

পবিত্র কুরআন পানিচক্র সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছে। এছাড়া অন্য আয়াতে কারীমাগুলোতে বলা হয়েছে, পানি মহাসাগর থেকে উঠে আসে এবং মেঘে পরিণত হয়। এটা মেঘমালায় ঘনীভূত হয়, বজ্রপাত এবং বৃষ্টিপাত হয়। এটা কুরআনের বিভিন্ন সূরার বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে। যেমন ঃ

সূরা মুমিনূন-এর ১৮ নং আয়াত,

সূরা রূম-এর ২৪ নং আয়াত,

সূরা নূর-এর ৪৩ নং আয়াত,

সূরা রূম-এর ৪৮ নং আয়াত,

এর সর্বোত্তম উদাহরণ হলো উপসাগরীয় স্রোত যা হাজার মাইল পর্যন্ত প্রবাহিত। উভয় প্রকারের পানি বর্তমান কিন্তু তারা মিশ্রিত হয় না।

আল-কুরআন সূরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ.

অর্থাৎ, আমি জীবন্ত সব কিছুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছি (এরপরও কি) তারা ঈমান আনবে না?

ভেবে দেখুন! আরবের মরুভূমিতে যেখানে পানির প্রচণ্ড অভাব, কে চিন্তা করতে পারে যে, প্রতিটি জীবন্ত জিনিস পানির তৈরি। যদি তারা অনুমান করে থাকে তাহলে তারা পানি ব্যতীত অন্য কিছুর কথাই চিন্তা করবে। এবং আজ বিজ্ঞান আমাদের সাইটোপ্লাজম সম্পর্কে, যা সেল (কোষ) গঠনের মূল উপাদান সম্পর্কে বলছে এর

৮০% ভাগ পানি, যেখানে জীবন্ত প্রাণীর ৫০ থেকে ৯০ ভাগ পানি। কে এই বাস্তব সত্যটি কুরআনে ১৪০০ বছর পূর্বে বর্ণনা করেছেন।

নাস্তিকটি চুপ থাকবে। সে আপনাকে কোনো জবাব দেবে না। 'সম্ভাব্যতা' নামে একটি থিওরি আছে, সেটা হলো দুটি সম্ভাবনাকে ধরে নেয়া। সে দুটি সম্ভাবনার একটি সঠিক এবং অন্যটি ভুল। আপনি যদি অনুমান করেন তাহলে দুটির মধ্যে একটি উত্তর ঠিক। এটি হলো ৫০%। যদি আমি এ কারণে লটারী দেই, উদাহরণস্বরূপ, তাহলে সঠিক উত্তর পাওয়ার সুযোগ আছে দুয়ের মধ্যে এক। এটি ৫০%। দ্বিতীয় বার যদি এ জন্য লটারী করি তাতেও দুয়ের মধ্যে এক। অর্থাৎ ৫০%। কিন্তু উভয় লটারীতে আসার সঠিক হবার সুযোগ আছে—

প্রথম এবং দ্বিতীয় মিলে দুয়ের মধ্যে একবার, আর তাহলে চার ভাগের এক ভাগ অথবা ৫০% এর ৫০% অর্থাৎ ২৫%। আমি যদি একটা ছক্কা নিক্ষেপ করি, যার ছয়টি তল আছে.....১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ অনুমান করলে আমার সঠিক হবার সুযোগ রয়েছে, ছয় ভাগের এক ভাগ। আমি সকল তিন বারের একবার ভাগে পাব প্রথম টস, দ্বিতীয় টস, তৃতীয় নিক্ষেপে আমি সঠিক হব প্রত্যেক তিন বারে $১/^{২} \times ১/^{২} \times ১/^{৬}$ মোট হবে ২৪ এর ১ বার।

আমরা 'সম্ভাব্যতা' থিওরি কুরআনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। ভেবে দেখুন! আমরা তর্কের স্বার্থে সম্ভাব্যতার সঙ্গে একমত হলাম, এক ব্যক্তি কুরআনে উল্লেখিত সব পেল, এভাবে যে কেউ অনুমান করেছে। যেখানে বলা হয়েছে পৃথিবী গোলাকার। একজন পৃথিবীর কী কী আকার অনুমান করতে পারে? কেউ ধারণা করে এটা চ্যাপ্টা, কেউ ধারণা করে এটা ত্রিকোণাকৃতির, কেউ ধারণা করে এটা চতুর্ভুজাকৃতির, কেউ ধারণা করে পঞ্চ কোণাকৃতির, কেউ ধারণা করে ষড়ভুজাকার, কেউ ধারণা করে সপ্তভুজাকার, কেউ ধারণা করতে পারে অষ্টভুজাকার, কেউ ধারণা পেতে পারে গোলাকার।

আমরা ধরে নিই আপনি পৃথিবীর ৩০ প্রকারের আকৃতির মনে করতে পারেন। যদি কেউ অনুমান করে তাহলে তার সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা ৩০ ভাগের একভাগ। চাঁদের আলো নিজস্ব না প্রতিবিম্ব যে কেউ অনুমান করলে তার সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা দুয়ের মধ্যে ১ ভাগ। উভয় বিষয় মিলে অনুমান করলে তার সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা $^{১}/২ \times ^{১}/৩০ = ৬০$ ভাগের একভাগ।

আরবের মরুভূমিতে একজন মানুষ কীসের তৈরি? জীবন্ত প্রাণী কীসের তৈরি এ ব্যাপারে একজন মানুষ কী ধারণা করতে পারে? মরুভূমির একজন ব্যক্তি চিন্তা করতে পারে যে এটি বালুর তৈরি, এটা কাঠের তৈরি হতে পারে, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, দস্তা, তেল, পানি, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন। আপনি কমপক্ষে দশ হাজার অনুমান করতে পারবেন এবং আরবের মরুভূমিতে এক ব্যক্তি পানির কথা সর্বশেষে চিন্তা করতে পারে।

আল-কুরআন বলে, প্রত্যেকটি জীবন্ত জিনিস পানির তৈরি

সূরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেছেন—

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ -

অর্থাৎ, আমরা প্রাণবন্ত সব কিছুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।

সূরা নূরের ৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেছেন—

অর্থাৎ, তারপর তা (বৃষ্টির পানি) দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় নানা ধরনের উদ্ভিদ বের করে আনি। যেটা আপনারা সম্প্রতি আবিষ্কার করলেন।

সূরা রা'দের ৩ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন–

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۔

অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রকারের ফল-মূল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়।

প্রাণিবিদ্যার ক্ষেত্রে এটা সূরা আনআমের ৩৮ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

অর্থাৎ, জমিনের বুকে বিচরণশীল প্রাণী ও দু ডানাকে প্রসারিত করে আকাশে উড্ডয়নশীল পাখিরা তোমাদের মতোই একই জাতিভুক্ত। বিজ্ঞান যা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে।

সূরা নাহল-এর ৬৮ ও ৬৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, "এটা হলো নারী মৌমাছি, যে বাইরে যায় এবং মধু সংগ্রহ করে।" এটা পুরুষ মৌমাছি নয় যা বিজ্ঞান সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে।

এ মৌমাছিগুলো নতুন বাগানের রাস্তা দেখিয়ে দেয়, যা তার ডানার ঝাপটানির দ্বারা পায়। এটা কুরআনে উল্লেখ পাওয়া যায় আমরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি।

সূরা আনকাবুত-এর ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۔

অর্থাৎ, আর পৃথিবীর সবচেয়ে ভঙ্গুর ঘর হচ্ছে মাকড়সার ঘর।

মাকড়সার জালের দৈহিক প্রকৃতি বর্ণনা ব্যতীতও এটি পারিবারিক সম্পর্কও আলোকপাত করছে, যাতে অনেক সময় মহিলা মাকড়সা পুরুষ মাকড়সাকে হত্যা করে। আল-কুরআনের সূরা নামল-এর ১৭ ও ১৮ নং আয়াতে বর্ণিত আছে,

"পিপীলিকারা একে অপরের সাথে কথা বলছে।"

আপনি মনে করতে পারেন এটা একটা আজগুবী গল্পের বই। কি! পিপীলিকারা একে অপরের সঙ্গে কথা বলে। বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, পোকা-মাকড় অথবা প্রাণীদের মানবজাতির জীবন পদ্ধতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। পিপীলিকাও কি? এরা মৃত দেহ কবর দেয়, এদের উচ্চতর যোগাযোগ পদ্ধতি রয়েছে, এদের হাট-বাজার পর্যন্ত রয়েছে।

আল-কুরআনে ঔষধ, শরীরতত্ত্ব ও ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কেও বলে

আল-কুরআন সম্পর্কেও কথা বলে। যেমন ঃ

সূরা নাহলের ৬৮ ও ৬৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন–

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۔

অর্থাৎ, মৌমাছির পেট থেকে মধু নির্গত হয় এবং মধুতে মানবজাতির নিরাময় রয়েছে।

আমরা এটি আজ আবিষ্কার করেছি। বর্তমান বিজ্ঞান আমাদের বলছে মধুর মধ্যে এন্টিসেপটিক বিদ্যমান রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, রাশিয়ান সৈন্যরা তাদের আহত স্থানে প্রলেপ দেয়ার জন্য মধু ব্যবহার করতো, যেটা টিস্যুতে খুব সামান্য দাগ থাকত। এটা নির্দিষ্ট কিছু এলার্জির চিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হয়। আল কুরআন দেহ-বিজ্ঞান সম্পর্কেও বলে। যা সূরা মুমিনূনের ২১ নং আয়াতে বর্ণিত আছে। এটি রক্ত পরিসঞ্চালন ও দুগ্ধ উৎপাদন-এর বর্ণনা দেয়। রক্ত পরিসঞ্চাল সম্পর্কে আল কুরআন বলার ৬০০ বছর পর ইবনে নাফীজ এটি আবিষ্কার করেন এবং আল কুরআন অবতীর্ণের ১,০০০ বছর পরে উইলিয়াম হার্ভে একে পশ্চিমা বিশ্বে পরিচিত করেন।

আল-কুরআন জন্মতত্ত্ব সম্পর্কে বর্ণনা আছে। আল-কুরআনে অবতীর্ণকৃত ১ম আয়াতগুলো যা ছিল সূরা আলাক। এতে আল্লাহ এরশাদ করেন–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ

অর্থাৎ, পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টি করেছেন আলাক থেকে। علق অর্থ আঁঠাল, জোঁকের মতো। এটা বিভিন্ন জ্রূণতত্ত্বীয় ডাটা যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো প্রফেসর কেইথ মূর-এর নিকট নেয়া হয়েছিল, যিনি এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। তিনি কানাডার টরেন্টোতে বসবাস করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, জ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে কুরআন যা বলে, তা কি সঠিক? কিছু আরবীয় কুরআনের নির্দেশনা মেনে চলে– যদি তোমরা না জানো তাহলে যে জানে তাকে জিজ্ঞেস কর। সুতরাং তারা প্রফেসর কেইথ মূরকে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি সঠিক? তিনি বললেন যে, কুরআনের অধিকাংশ বিষয় জ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে সর্বশেষ আবিষ্কারের সাথে ১০০ ভাগ সঠিক, কিন্তু কিছু সুনির্দিষ্ট বর্ণনা কুরআনে রয়েছে, যে সম্পর্কে আমি মন্তব্য করা অসম্ভব। কারণ, আমি নিজেই এ সম্পর্কে অভিজ্ঞ নই এবং এ ধরনের একটি আয়াত এই যে, আমরা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি এমন বস্তু হতে, যা আঁঠাল জোঁকের মতো বস্তু।

তিনি গেলেন এবং জোঁক-এর ফটোগ্রাফ নিলেন এবং তার গবেষণাগারে খুবই শক্তিশালী একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা জ্রূণ-এর প্রাথমিক ধাপগুলো পরীক্ষা করলেন– এটি ফটোগ্রাফের সঙ্গে একেবারে মিলে গেল। অতঃপর তিনি ঘোষণা করলেন, কুরআন যা-ই উল্লেখ করেছে এটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক এবং কুরআন থেকে তিনি নতুন যে ডাটা পেলেন, তা তিনি তার গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। এ গ্রন্থ এর নাম "The Developing Human" (মানব উৎকর্ষ)। তিনি তৃতীয় সংস্করণ বের করেন এবং এর জন্য ঐ বছরের মধ্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত লিখিত গ্রন্থের জন্য সর্বোত্তম গ্রন্থ লেখার পুরস্কারটিও প্রাপ্ত হোন। তিনি আরো বলেন যে, জ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে আল-কুরআন যা উল্লেখ করে, তা আমাদের দ্বারা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হলো মাত্র। এটা হলো চিকিৎসার অন্যতম শেষ শাখা। এটা কোনো মানব রচিত হতে পারে না। এর মূল অবশ্যই স্বর্গীয় (আল্লাহ প্রদত্ত)।

আল-কুরআনের সূরা তারিকের ৫ থেকে ৭ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ـ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ـ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ـ

অর্থাৎ, মানুষ যেন দেখে কোন জিনিস থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বানানো হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে, যা মেরুদণ্ড ও পাঁজর থেকে বের হয়ে আসে।

বর্তমানে আমরা অবগত হই যে, যৌনাঙ্গগুলো, নারী-পুরুষের ভ্রূণের বয়সব্যাপী যেখানে কিডনি স্থাপিত, সেখান থেকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মেরুদণ্ড এবং একাদশ ও দ্বাদশ পাঁজরের মধ্যখান থেকে।

আল-কুরআনের সূরা নজমের ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াত, সূরা কিয়ামাহ'র ৩৭ থেকে ৩৯ নং আয়াতে– পুরুষই শিশুর নারী-পুরুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য দায়ী। যা আমরা সম্প্রতি আবিষ্কার করলাম। আল-কুরআন বলে ভ্রূণ আবৃত হয়, ভ্রূণ আবৃত হয় তিনটি অন্ধকার স্তরে, যা আজ নিশ্চিত হওয়া গেল, যেখানে কুরআন ভ্রূণ-এর স্তরগুলো সম্পর্কে স্ববিস্তারে আলোচনা করেছে।

মানব সন্তানকে সূরা মুমিনূন-এর ১২ থেকে ১৪ নং আয়াতে এবং সূরা হাজ্জ-এর ৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন–

সৃষ্টি করা হয়েছে সামান্য পরিমাণ তরল পদার্থ থেকে। এমন কিছু থেকে, যা লেগে থাকে, জোঁকের মতো বস্তু। তাকে مُضْغَةً (মুদগাহ্)-তে পরিণত করেন, চর্বিত বস্তুর মতো। عِظَامًا (ইজামান) হাড়ে পরিণত করেন, তাকে আবৃত করেন। لَحْمًا (লাহমান) গোশ্ত দ্বারা, পেশী দ্বারা। আল-কুরআন ভ্রূণের বেড়ে ওঠার স্তরগুলোকে সবিস্তারে আলোচনা করে। সূরা সাজদাহ্ আয়াত নং ৯, সূরা ইনসান আয়াত নং ২–এ

"যে ...ইনি আল্লাহ, যিনি তোমাকে শোনা ও দেখার যোগ্যতা দান করেছেন।"

বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে শোনার যোগ্যতা আগে আসে। এটা গর্ভবতী হবার পঞ্চম মাসে পূর্ণরূপে উন্নত হয়। অতঃপর গর্ভবতী হবার ৭ম মাসে চক্ষু চিরে বের হয়। আল-কুরআন সূরা কিয়ামাহ'র ৩ ও ৪ নং আয়াতে উত্তর দেন, যখন জিজ্ঞাসা করা হয় আল্লাহ কীভাবে বিচারের দিনে হাড়গুলো একত্রিত করবেন? আল্লাহ জবাব দেন আমরা শুধু হাড়গুলোই একত্রিত করতে সক্ষম নই বরং আমরা তোমাদের আঙ্গুলের ছাপগুলোও একত্র করতে সক্ষম হবো। আল-কুরআন বলেছে, আল্লাহ আঙ্গুলের ছাপ একত্র করতে সক্ষম, এর অর্থ কী?

আল-কুরআন আঙ্গুলের ছাপ পদ্ধতি সম্পর্কে ১৪০০ বছর পূর্বেই আলোচনা করেছিল

১৮০০ সালে স্যার গোল্ট আঙ্গুলের ছাপ পদ্ধতির বিবরণ দেন, যা আমারা আজ মানুষ সনাক্ত করতে ব্যবহার করি। বিশেষ করে দুষ্কৃতিকারী বা অপরাধীদের সনাক্ত করতে সাহায্য করে। কোনো দুটি আঙ্গুলের ছাপ, এমনকি দশ লক্ষ লোকের ভেতরও সমরূপ হবে না। আল-কুরআন আঙ্গুলের ছাপ পদ্ধতি সম্পর্কে ১৪০০ বছর পূর্বে বলেছে। বিজ্ঞানের বহু উদাহরণ বর্তমানে বিদ্যমান। আপনারা যদি বেশি বিস্তারিত আল-কুরআনে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পর্কে উপলব্ধি করতে চান, আপনারা 'কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান : সাংঘর্ষিক না আপসকামী' ভিত্তিক ক্যাসেটটি দেখুন।

আরেকটি বৈজ্ঞানিক সত্য তুলে ধরতে চাই তাহলো, থাইল্যান্ডে প্রফেসর থাগাদা শাউন নামে একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি ব্যথা গ্রহিতার ক্ষেত্রে প্রচুর গবেষণা করেছেন। পূর্বে বিজ্ঞান চিন্তা করতো যে, মস্তিষ্কই ব্যথার (অনুভবের) জন্য দায়ী। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করল যে, ব্যথা গ্রহিতা চামড়ায়ই রয়েছে যেটা ব্যথা অনুভবের জন্য দায়ী।

সূরা নিসা'র ৫৬ নং আয়াতে কুরআনে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, আমরা তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে ধাবিত করব এবং যখনই চামড়া পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা নতুন চামড়া গজিয়ে দেব, যাতে তারা যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে।

পরোক্ষভাবে কুরআন এখানে বলছে, যে চামড়ায় এমন জিনিস রয়েছে যা ব্যথার জন্য দায়ী। এটা ব্যথা গ্রহণকারী সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে।

প্রথমে অধ্যাপক থাগাদা শাউন বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছিলেন না। যাচাই করার পরক্ষণে তিনি অনুধাবন করতে পারলেন এ গ্রন্থ (আল-কুরআন) ব্যথাগ্রাহী সম্পর্কে বলছে ১৪০০ বছর পূর্বে। অতপর তিনি কায়রোর একটি মেডিকেল কনফারেন্সে ইসলাম গ্রহণ করেন। বলেন "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" "আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।"

এবার নাস্তিক ব্যক্তিটিকে প্রশ্ন করুন, কে এসব বৈজ্ঞানিক সত্য আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন। একটা জবাবই সে আপনাকে দিতে পারে, একই, যা সে ইতিপূর্বে আপনাকে দিয়েছে। কে সেই ব্যক্তি যে অজানা বস্তুর গঠন বলতে পারে? ইনিই স্রষ্টা, ইনি আবিষ্কারক, ইনিই তৈরি কারক, ইনিই উৎপাদক। একইভাবে যে ব্যক্তি এসব কথা কুরআনে বলতে পারেন, তিনিই তৈরি কারক, উৎপাদক এবং যিনি পৃথিবীর স্রষ্টা। এরপর পরিচয় যাকে আমরা ইংরেজিতে 'গড' বলি, অধিকতর সঠিক তাঁকেই আরবিতে 'আল্লাহ' বলা হয়।

ফ্রান্সিস বেকন যথার্থই বলেছেন যে, বিজ্ঞানে অল্প জ্ঞান তোমাদের নাস্তিক বানায় কিন্তু বিজ্ঞানের গভীর জ্ঞান তোমাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহয় বিশ্বাসী বানায়। আশ্চর্যের বিষয় নয়, আজ বিজ্ঞানীরা 'লা ইলাহা গড'-এর ত্যাগকারীর মডেল এবং সেগুলো ইল্লাল্লাহ-এর গড নয়।

আমি আমার বক্তব্যের প্রারম্ভে যে দ্বিতীয় আয়াত উদ্ধৃত করেছিলাম তার অর্থ বলার মাধ্যমে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করব।

সূরা ফুসসিলাত-এর ৫৩ নং আয়াত। যাতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, অচিরেই আমি আমার নিদর্শনসমূহ দিগন্ত বলয়ে প্রদর্শন করব এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও তো (আমি দেখিয়ে দিব) যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকট এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই (কুরআনই) সত্য।

ডা. জাকির নায়েকের বক্তৃতার পরিসমাপ্তির পর, অনুষ্ঠানের কো-অর্ডিনেটর ডা. মুহাম্মাদ তাঁকে তাঁর বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলিকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর তিনি শ্রোতৃমণ্ডলিকে প্রশ্নোত্তর পর্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেটা হলো এ পর্বের দ্বিতীয় অংশ। এরপর ডা. জাকির আহ্বান করেন যে শ্রোতৃমণ্ডলি প্রশ্ন করতে পারেন এবং ডা. জাকির তার জবাব প্রদান করতে পারেন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন ঃ আমার নাম মিসেস সারলা রামচন্দর। আমার প্রশ্ন হল, কেন মুসলমানরা খোদাকে 'আল্লাহ' বলে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন যে প্রশ্নটি করেছেন তাহলো 'কেন মুসলমানরা খোদাকে আল্লাহ বলেন?' আমার বক্তব্যে আমি আল-কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর পরিচয় সূরা ইখলাসের আলোকে তুলে ধরছি। সূরা ইখলাসে বলা হয়েছে– "বলুন, তিনিই আল্লাহ এক এবং একক, আল্লাহ অদ্বিতীয়, অনন্ত, তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কারো দ্বারা জন্মগ্রহণও করেন নি। এ পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"

সূরা ইসরা-এর ১১০ নং আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেছেন–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى -

অর্থাৎ, বলুন, আল্লাহ নামে আহ্বান কর, কিংবা রহমান বলে, তাঁকে যে নামেই ডাক না কেন, তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে।

আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম আছে এ সংবাদ নিম্নোক্ত বিভিন্ন সূরায় আলোকপাত করা হয়েছে–

সূরা আরাফ-এর ১৮০ নং আয়াত,

সূরা হাশর-এর ২৪ নং আয়াত এবং

সূরা ত্বাহা-এর ৮ নং আয়াতে।

"আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম আছে।" কিন্তু এসব নাম যেন কোনোরূপ মনের উপর ছবি না আনে। তবে নাম হতে হবে সুন্দর।

গড্‌কে 'আল্লাহ' বলার কারণ

মুসলিমরা 'খোদা' বলার পরিবর্তে 'আল্লাহ' বলে। 'গড্' ইংরেজি শব্দ, খাঁটি আরবি শব্দ আল্লাহ। ইংরেজি "গড্" শব্দের নিম্নরূপ রূপান্তর ঘটতে পারে। যেমন:

যদি God এর সাথে s যুক্ত করলে Gods অর্থাৎ বহুবচন হবে। আপনি আল্লাহর সাথে s যোগ করতে পারেন না। 'আল্লাহর' বহুবচন নেই। আল্লাহ, যেমন আল-কুরআনে বর্ণিত আছে "বলুন, তিনি আল্লাহ, এক এবং একক।" যদি আপনি ess যুক্ত করেন তাহলে Godess অর্থাৎ নারী God হবে। আল্লাহর নারী-পুরুষ বলতে কিছু নেই। আল্লাহর কোনো লিঙ্গভেদ নেই। আপনি যদি বড় হাতের G দিয়ে God লেখেন তাহলে এটা হবে সত্যিকার যদি ছোট হাতের g দিয়ে god লিখেন তাহলে এর অর্থ হবে নকল খোদা।

ইসলামে একজনই সত্য আল্লাহ। অন্য কোনো মিথ্যা আল্লাহ নেই। যদি আপনি god-এর সাথে father যুক্ত করেন তাহলে হবে godfather. সে আমার গডফাদার। আপনি আল্লাহর সাথে 'আব্বা' কিংবা 'ফাদার' যুক্ত করার সুযোগ নেই। 'আল্লাহ আব্বা' কিংবা 'আল্লাহ ফাদার' বলে ইসলামে কিছু উল্লেখ নেই। যদি আপনি god-এর সাথে mother যুক্ত করেন তাহলে হবে godmother। আপনি আল্লাহর সঙ্গে 'মাদার' বা 'আম্মি

আল্লাহ' বলার অবকাশ নেই। ইসলামেম 'আম্মি আল্লাহ' বলতে কিছু নেই। যদি আপনি গড এর পূর্বে 'টিন' লাগান তাহলে হবে 'টিনগড' বাতিল গড। ইসলামে 'টিন আল্লাহ' বলতে কিছু নেই। আল্লাহ খাঁটি এবং একক। আপনি তাঁকে যে কোন নামে ডাকতে পারেন, তবে অবশ্যই তা হতে হবে সুন্দর নাম। আমি আশা করি উত্তর যথেষ্ট হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আমার নাম কাসিম দবীর। আমার প্রশ্ন হলো অ্যারুন শৌরী বলে যে, আল-কুরআনে উল্লেখিত, উত্তরাধিকারীদের প্রতি প্রদত্ত অংশগুলো যোগ করেন তাহলে যোগফল ১ এর অধিক হয়। অতএব এ্যারুন শৌরী দাবী করে যে, কুরআনের রচয়িতা গণিতের জ্ঞান নেই, অনুগ্রহ করে পরিষ্কার করুন।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই যে প্রশ্ন করেছেন যে, অ্যারুন শৌরী আল-কুরআনের সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াতের --- উত্তরাধিকারীদের অংশগুলো একত্র করলে অংশগুলো ১-এর অধিক হয়; অতএব তাঁর দাবী হলো কুরআনের রচয়িতা গণিত সম্পর্কে জ্ঞাত নন।

আমি আমার আলোচনায় আলোকপাত করেছি, হাজার হাজার মানুষ যারা কুরআনের ভুল-এর দিকে ইঙ্গিত প্রদান করেছে; কিন্তু আপনি যদি ব্যাখ্যা করেন, তাদের সবগুলোই অসত্য। তাদের একজনও সত্য বলেনি।' কুরআন উত্তরাধিকারের বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে আলোকপাত করেছে।

সূরা বাকারার ১৮০ নং আয়াত, সূরা বাকারার ২৪০ নং আয়াত সূরা নিসার ৯ নং আয়াত

সূরা নিসার ১৯ নং আয়াত, সূরা মায়িদার ১০৫ নং আয়াত

এটি বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ আছে, তবে অংশগুলোর বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্রে সূরা নিসার আয়াত নং ১১ ও ১২, একই সূরা আয়াত নং ১৭৬।

অ্যারুন শৌরীর উদ্ধৃত আয়াতের অনুবাদ যেটা সূরা নিসার আয়াত নং ১১ ও ১২ এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমাদের সন্তানদের উত্তরাধিকারের অংশ সম্পর্কে পুরুষ-নারীর দ্বিগুণ প্রাপ্য। কেবল একজন কন্যা দুই হয়ে অর্ধেক দুই এর অধিক কন্যা হয় তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ, যদি কন্যা মাত্র একজন হয় তাহলে অর্ধেক প্রাপ্য। যদি পিতামাতা দু'জন তাহলে প্রত্যেক ছয় এর একাংশ প্রাপ্য, যদি তাদের সন্তান থাকে, যদি সন্তান না থাকে তাদের মা পাবে তিন ভাগের একভাগ। অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। ১২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

"তোমার স্ত্রী যা ছেড়ে রেখে গেছে– সন্তান থাকলে তার চারভাগের এক ভাগ এবং সন্তান না থাকলে অর্ধেক তোমরা পাবে। অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমরা যা ছেড়ে রেখে যাও সন্তান না থাকলে তাঁর চার ভাগের একভাগ এবং সন্তান থাকলে পাবে আট ভাগের একভাগ তোমাদের স্ত্রীগণ।"

এটা কিছু দ্বিধান্বিত বিষয় তবে আপনারা দ্বিধান্বিত হবেন না। আপনি বাড়ি গিয়ে দেখতে পারেন। সংক্ষেপে সূরা নিসার ১১ নং আয়াতে প্রথম যে অংশের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা সন্তানদের, অতঃপর পিতা-মাতার। পরবর্তীতে ১২ নং আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর অংশ। উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ইসলাম বিস্তারিত বর্ণনা করে। আল-কুরআন মূল নির্দেশনা দান করে। আপনি বিস্তারিতভাবে জানতে হলে হাদীস শরীফ দেখেন। একজন মানুষ তাঁর পূর্ণ জীবন শুধু ইসলামের উত্তরাধিকার বিধানের গবেষণায় কাটাতে পারে। অ্যারুন শৌরী মাত্র দু'টি আয়াত-এর উদ্ধৃতি দিয়েই এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের প্রত্যাশা করে। এটা কিছুটা ঐ রকম, যে ব্যক্তি সরল

বছরেরও পরে এবং আরবিতে সবার আগে যে নিউ টেস্টামেন্ট আমাদের হাতে যেটা আছে, তা প্রকাশিত হয় ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের প্রায় এক হাজার বছর পরে।

আমি এ ব্যাপারে একমত হতে পারি যে, বাইবেল এবং কুরআনের মধ্যে আংশিক মিল রয়েছে। এতে একথা বুঝায় না যে, পরেরটা পূর্বেরটা থেকে নকল করা হয়েছে। এটা এ অর্থ দেয় যে, উভয়েরই তৃতীয় উৎস আছে। আল্লাহর অবতীর্ণ সব সংবাদেই আল্লাহকে বিশ্বাসের কথা উল্লেখ আছে। তাঁদের একই সংবাদ আছে। পরববর্তী সকল অবতীর্ণ কিতাবেরই সময়-সীমা নির্ধারিত ছিল। যেমন আমি উল্লেখ করেছি, সেগুলো তাদের মূল গঠনের ওপর নেই। সেগুলোতে অন্যায় সংযোজন (তাহরীফ) ঘটেছে। সেগুলোতে অনেক মানব সংযোজিত মিথ্যা কাহিনী সংযুক্ত রয়েছে। তারপরেও সেগুলোতে আবশ্যকীয়ভাবে আংশিক বিষয়ের মিল রয়েছে। শুধু মিলগুলোর কারণে বলা ভুল হচ্ছে যে, এগুলো নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বাইবেল থেকে নকল করেছেন। এক্ষেত্রে এটাও প্রমাণিত হয় যে, যীশু নাউযুবিল্লাহ নিউ টেস্টামেন্ট, ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে নকল করেছেন, কেননা নিউ এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। উভয় গ্রন্থ একই উৎস (আল্লাহর) থেকে আগত।

মনে করুন কেউ পরীক্ষায় নকল করল, আমি উত্তর পত্রে লিখব না, আমি আমার প্রতিবেশীর থেকে নকল করলাম। আমি লিখব না, আমি x y z থেকে নকল করেছি। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরিষ্কারভাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, ঈসা (আ:), মূসা (আ:) এবং সব নবীই আল্লাহ প্রেরিত। এটা তাঁদের সঠিক সম্মান ও ও মর্যাদা দান করে। তিনি যদি নকল করতেন তাহলে তিনি বলতেন না যে ঈসা (আ:), মূসা (আ:) আল্লাহর নবী ছিলেন। এটা প্রমাণ করে যে, তিনি নকল করেন নি; শুধু ঐতিহাসিক বিষয়াবলির ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তির দ্বারা বলা কঠিন– কোনটি সঠিক, বাইবেল না কুরআন।

যাহোক, আমরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োগ করে পরীক্ষা করতে পারি। এর উপরিভাগে যদি আপনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, দেখবেন অনেক ঘটনা এবং দিক আছে যেগুলো কুরআনে যেমন উল্লেখ আছে তেমনি বাইবেলেও উল্লেখ পাওয়া যায়।

আপনি যদি উপরিভাগে দৃষ্টি দেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন অনেক ঘটনা এবং বিষয় কুরআনে যেমন উল্লেখ আছে বাইবেলেও তেমনি রয়েছে। আপনি এক রকমই দেখতে পাবেন। কিন্তু আপনি যদি পর্যালোচনা করেন তাহলে আকাশ পাতাল পার্থক্য পাবেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে, বাইবেলে উল্লেখ আছে, জেনেসিস প্রথম অধ্যায়, বিশ্ব স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে এটি ৬ দিনে সৃষ্টি হয়েছে এবং দিনের বর্ণনা করা হয়েছে ২৪ ঘণ্টা সময়। আল-কুরআনও বিভিন্ন স্থানে যেমন ঃ

সূরা আল আরাফের ৫৪ নং আয়াত এবং সূরা ইউনুস-এর ৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "জান্নাত এবং পৃথিবী ৬ আইয়্যামে সৃষ্টি করেছি।" আরবি শব্দ أَيَّام শব্দটি يَوْم শব্দের বহুবচন যার অর্থ দিন। يَوْم অর্থ দিন। এর অর্থ অনেক অনেক দীর্ঘ সময় এমন কি যুগও বুঝায়। অতএব এখানে আল-কুরআন যখন বলবে জান্নাত এবং পৃথিবী ছয় যুগ ধরে অর্থাৎ অনেক অনেক দীর্ঘ সময় ধরে সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে এ বর্ণনায় বিজ্ঞানীদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু পৃথিবী মাত্র ২৪ ঘণ্টার ছয় দিনে সৃষ্টি হয়েছে এটা অবৈজ্ঞানিক তথা অযৌক্তিক।

বাইবেলে ১ নং 'জেনেসিস অধ্যায়ের ৩ ও ৫ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে; প্রথম দিনে দিন এবং রাতের সৃষ্টি হয় এবং বিজ্ঞান আমাদের বলছে মহাবিশ্বের আলো সৃষ্টি হয়েছে নক্ষত্রের প্রতিক্রিয়ায় এবং বাইবেলে জেনেসিস ১ম

অধ্যায়-এর শ্লোক নং ১৪ ও ১৯ এ উল্লেখ আছে যে, সূর্য চতুর্থ দিনে সৃষ্টি হয়েছিল, কিভাবে এটা সম্ভব যে, ফলাফল যেটা হলো 'আলো' সূর্যের চারদিন পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে? অযৌক্তিক, এটা অবৈজ্ঞানিক, পৃথিবী যা দিন রাতের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন, তা সৃষ্টি হয়েছে তৃতীয় দিনে। আল-কুরআনও আলো এবং সৃষ্টি সম্পর্কে বলে তবে এটা অসম্ভব ও অবৈজ্ঞানিক ধারাবাহিকতা প্রদান করে না। আপনারা কি মনে করেন যে, নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এটা বাইবেল থেকে নকল করে সংশোধন করে ঘটনাক্রমগুলো সাজিয়ে নিয়েছিলেন? এগুলো ১৪০০ বছর পূর্বে কেউই জানতেন না।

বাইবেলের জেনেসিস ১ম অধ্যায়ের ৯ থেকে ১৩ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে, পৃথিবী তৃতীয় দিনে সৃষ্টি করা হয়, ১৪ থেকে ১৯ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে যে, সূর্য এবং চন্দ্র চতুর্থ দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। আজ বিজ্ঞান আমাদের বলছে যে, পৃথিবী এবং চন্দ্র মূল নক্ষত্রের অর্থাৎ সূর্যের অংশ মাত্র। এটা অসম্ভব যে, পৃথিবী সূর্যের আগে সৃষ্টি হয়েছে। এটা অবৈজ্ঞানিক। বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায় নং-১ শ্লোক নং-১১ এবং ১৩ তে সবজির রাজত্ব, বীজ, বীজ বহনকারী, চারাগাছ, লতা, গাছ-পালা তৈরি হয়েছিল তৃতীয় দিনে এবং ১৪ থেকে ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সূর্য সৃষ্টি হয়েছিল চতুর্থ দিনে। কিভাবে সবজির মূল সূর্য ছাড়াই অস্তিত্বে আসলো?

বাইবেলে জেনেসিস ১ম অধ্যায়, শ্লোক নং ১৬-তে বলা হয়েছে যে, সর্বশক্তিমান খোদা দু'টি বড় আলো তৈরি করেছেন, সূর্য যেটা বড় আলো দিনকে পরিচালনা করার জন্য এবং চন্দ্র অপেক্ষাকৃত কম আলো, রাতকে পরিচালনা করার জন্য। বাইবেল বলে সূর্য এবং চাঁদের নিজস্ব আলো রয়েছে। আমি পূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, আল কুরআনের সূরা ফুরকান-এর ৬১ নং আয়াতে বর্ণিত আছে চন্দ্রের আলো প্রতিবিম্বিত আলো। এটা কিভাবে সম্ভব যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সব বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাকে নকল এবং সংগ্রহ করেছেন। এটা সম্ভব নয়।

আপনি বাইবেল এবং কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলি পর্যালোচনা করেন তাহলে উভয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখবেন। বাইবেলে আদম (আ)-এর সৃষ্টির ঘটনা বর্ণিত আছে। প্রথম মানব যিনি এ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছিলেন তিনি হলেন আদম (আ) এবং বাইবেলে তার আনুমানিক তারিখ দিয়েছে ৫৮০০ বছর আগে। আজ প্রত্নবিদ্যা ও নৃবিদ্যার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞান বলছে যে, প্রথম মানব দশ হাজার বছর আগে বিদ্যমান ছিল। আল-কুরআনও আদম (আ) সম্পর্কে আলোকপাত করেছে যে, তিনি প্রথম মানব ছিলেন; কিন্তু অবৈজ্ঞানিক কোনো তারিখ ঘোষণা করে নি।

বাইবেলে নূহ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করে যে, সেখানে যে প্লাবন হয়েছিল, তা ছিল পৃথিবীব্যাপী প্লাবন। জেনেসিস ৬, ৭ ও ৮ নং অধ্যায়ে উল্লেখ আছে ঃ সেখানে হয়েছিল এক বিশ্বব্যাপী প্লাবন, এর ফলে পৃথিবীতে বসবাসকারী সব প্রাণী ডুবে যায় এবং মারা যায় একমাত্র এ সব ছাড়া যারা নূহ (আ)-এর কিস্তিতে ছিলেন। বাইবেলে উল্লিখিত আনুমানিক তারিখ হলো একবিংশ বা দ্বাবিংশ শতাব্দী। আজ প্রত্নতত্ত্ব সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মিসরের ১১তম রাজবংশ এবং ব্যাবিলনের ২য় রাজবংশ, খ্রিস্টপূর্ব একবিংশ শতাব্দীতে কোনরূপ বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই চলছিল। অর্থাৎ এ ধরনের প্লাবন সেখানে হয়নি।

আল-কুরআনেও নূহ (আ)-ও বন্যা সম্পর্কে উল্লেখ আছে, কিন্তু কোনো তারিখ উল্লেখ নেই এবং আল-কুরআন যে, প্লাবনের কথা বলে তা ছিল স্থানীয় প্লাবন, এটি বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্তির কথা বলেনি এবং এ প্লাবন ছিল নূহ (আ)-এর লোকদের মধ্যে এবং এর ওপরে বিজ্ঞানীদের কোনো দ্বীধা দ্বন্দ্ব নেই।

সুতরাং আপনি নিজেই বের করে নিতে পারেন যে, আল-কুরআন বাইবেল থেকে নকল করা হয়েছে কিনা?

ডা. মুহাম্মদ ডা. জাকিরকে এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং শ্রোতাদেরকে শুধু বিষয়-এর সাথে (কুরআন কি আল্লাহর বাণী?) সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করার অনুরোধ করেন। যেহেতু কেউ একজন আলোচিত বিষয়ের বাইরে প্রশ্ন করেছিলেন।

তিনি শ্রোতাদেরকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করারও অনুরোধ করেন, যেহেতু তখন সেশন ইংরেজিতে চলছিল। তাই একজন হিন্দিতে প্রশ্ন করেছিল যদিও ডা. জাকির নায়েক ইংরেজি এবং হিন্দিতেও প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম ছিলেন। অনুষ্ঠানটি ইংরেজিতে চলছিল বলেই ইংরেজিতে প্রশ্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। একজন বয়স্ক লোক হিন্দিতে প্রশ্ন করলেও ডা. জাকির বিস্তারিত উত্তর প্রদান করেন।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই প্রশ্ন আরোপ করার পূর্বেই বলেছেন, সব হিন্দু ভগবান রজনীশকে বিশ্বাস করেন না। এখানে ভিডিও রেকর্ডগুলো রয়েছে, আপনি সেগুলো দেখতে পারেন, আমি বলেছি কতিপয় ব্যক্তি ভগবান রজনীশকে বিশ্বাস করে। সুতরাং আপনার এবং আমার মাঝে একটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। আমি বলিনি যে সব হিন্দু তাকে বিশ্বাস করেন। হিন্দুদের বিশ্বাস সম্পর্কে আমি জানি, এমনকি আমি শাস্ত্রও পড়েছি। দাদা একটি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন, আমি কি একমত যে আল-কুরআন বলে, আল্লাহ অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং অনেক আসমানী কিতাবও অবতীর্ণ করেছেন। আমি কি বেদে বিশ্বাস করি? আমি কি বেদ শাস্ত্রে বিশ্বাস করি এবং আমি অন্যান্য নবীকে বিশ্বাস করি কি-না? সে হলো মূল প্রশ্ন আমি তাঁর সঙ্গে একমত। আল-কুরআন সূরা ফাতির-এর ২৪ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন– وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ـ

অর্থাৎ, এমন কোনো জাতি ছিল না, যাদের নিকট নবী আসেনি।

সূরা রাদ-এর ৭ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ـ

অর্থাৎ, আপনি একজন ভীতি প্রদর্শনকারী মাত্র, আর প্রত্যেক কওমের জন্যই পথ প্রদর্শক রয়েছে।

আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী আপনি বেদশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন কি না? অন্যান্য নবীগণ আল্লাহ প্রেরিত কি? আল-কুরআনে মাত্র ২৫ (অথবা ২৬ জন) নবীর নাম উল্লেখ করেছে। আদম(আঃ) , ইবরাহীম(আঃ), মূসা(আঃ), ইসমাঈল(আঃ), ঈসা (আ), মুহাম্মদ (সাঃ) কিন্তু হাদীস অনুযায়ী এক লক্ষ চব্বিশ হাজারেরও বেশি নবী পৃথিবীতে আগমন করেছেন। আমরা ২৫ জনের নাম জানি। বাকিরা নবী হতেও পারেন, নাও হতে পারেন, আমরা নিশ্চয়তা দিয়ে কিছু বলতে পারব না।

আপনার প্রশ্নানুসারে আপনি কি বেদকে আল্লাহর বাণী মনে করেন, আসুন আমরা দেখি কুরআন এবং বেদের মধ্যে কোনো বিষয়ের মিল পাওয়া যায় কি না? হ্যাঁ আছে, বিষয়টা যদি আল্লাহর বিষয়ে হয়। কুরআনও এ সম্পর্কে বলে বেদও এ সম্পর্কে বলে। যদি আপনি বেদ পড়ুন, দেখবেন।

যযুরবেদ অধ্যায় ৩৩, শ্লোক নং ০৩ "খোদা হলো নিরাকার ও সন্দেহহীন।" একই যযুরবেদ অধ্যায়-৪০, শ্লোক নং ০৮ বলে, খোদার কোনো প্রতিমূর্তি নেই, কোন দেহ নেই।"

একই যযুরবেদ অধ্যায়-৪০, শ্লোক নং-৯ বলে যে "ঐ সব লোক যারা সৃষ্ট জিনিসের পূজা করে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত।" আরো বলা হয়েছে ঐ খোদা সম্পর্কে, "খোদা মাত্র একজন, কোনো দ্বিতীয় নেই, সামান্যতেও নেই।" এটি ঋগ্বেদে ৬ নং ভলিউম-০৮, অধ্যায়-১, শ্লোক নং-০১-এ বলা হয়েছে- "সকল প্রশংসা শুধু তাঁরই।" ঋগ্বেদে ভলিউম-৬, অধ্যায়-৪৫, শ্লোক নং-১৬-এ বলা হয়েছে ঃ "খোদা একজনই, তাঁর পূজা কর।" আমরা এতে বিশ্বাস করি। বেদের এ সব অংশে বিশ্বাস করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। যেগুলো আল্লাহর বাণী হতে পারে এবং কুরআন হলো ভুল- নির্ভুল নিরূপণের মাপকাঠি। কারণ, এটিই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত অবতীর্ণকৃত মহাগ্রন্থ।

আমরা মুসলিমরা, আমাদের কোনোই আপত্তি নেই এ সব বাণীকে আল্লাহর বাণী হিসেবে গ্রহণ করতে। যেখানে অন্য জিনিস হতে পারে, যেরূপ আমরা বলছি, সেখানে অন্যায় সংযোজন হতে পারে, যেখানে মানব কর্তৃক সংযোজন হয়ে থাকতে পারে, সেগুলোকে আমরা খোদার বাণী হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। বাইবেলে যেমন অবৈজ্ঞানিক ঘটনা আছে, বেদেও সেরকম আছে। আমি তা আলোচনা করতে চাই না। তবে আমাদের এ ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই যে, মূল বেদ হয়তো আল্লাহর বাণীও হতে পারে।

মনে করুন, ইঞ্জিল- আল-কুরআনে উল্লেখ আছে যে, ইঞ্জিল হলো ওহী, যা ঈসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। এটা সে ওহী, যা যীশুকে প্রদান করা হয়েছিল। সুতরাং ইঞ্জিল আল্লাহর বাণী হওয়ার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। নবীদের ব্যাপারে? অনেক নবী ছিলেন। রাম ও কৃষ্ণের নবী হওয়ার ব্যাপারে, আমরা বলতে পারি হতে পারে, তবে আমরা নিশ্চিত নই। কিছু মুসলিম আছেন, তাঁরা বলেন, 'রাম আলাইহিস সালাম'। এটা ভুল। দেখুন, তারা তাদের পিঠ চাপড়াচ্ছে। আমি হিন্দুদের পিঠ চাপড়ানোর দলে নই। সুতরাং সে আমার পিঠ চুলকাচ্ছে। আমি যা বলছি তাহলো তারা হতে পারেন, রাম যদি আল্লাহর নবী হয়েও থাকেন, বেদ যদি আল্লাহর শাস্ত্রও হয়ে থাকে, যেমন আমি উল্লেখ করেছি, সেগুলো ছিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। সেগুলো ছিল ঐ সময়ের লোকদের জন্য এবং সেগুলোর স্থায়িত্ব বর্তমানে নেই।

আল-কুরআন হলো আল্লাহর সর্বশেষ বাণী, এমনকি ইঞ্জিল, বাইবেল অথবা বেদ যদিও আল্লাহর বাণী ছিল, সেগুলো ছিল তখনকার সময়ের জন্য আজ আর এগুলো প্রয়োজন নেই। আল-কুরআন হলো আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত বাণী এবং সর্বশেষ রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। আমাদেরকে কুরআন এবং নবী (সাঃ)-এর অনুসরণ করতে হবে। আশা করি আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ঃ আমার নাম মেহনাজ সাঈদ এবং আমি একজন ছাত্রী। আমার প্রশ্ন হলো, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন একটি প্রশ্ন করেছেন যে, কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন। এমন প্রশ্ন সাধারণত নাস্তিক বা যুক্তিবাদীরা করে থাকে। এটা আমাকে একটি ঘটনা মনে করিয়ে দিল যে, আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মুম্বাই-এর এক যুক্তিবাদী গ্রুপের সাথে আলোচনায় গেলেন, তারা নাস্তিক গ্রুপ এবং সে তাদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বুঝাবার চেষ্টা করলেন। সে এভাবে শুরু করেছিল যে, এটি একটি কাপড়, কে একে তৈরি করেছে? এটা কোত্থেকে আসল? তারা বলল একজন তাঁতী এটা সৃষ্টি করেছে। ভালো, এর একজন স্রষ্টা আছে। হ্যাঁ এটি একটি বই, এটা কোত্থেকে আসল? কলমটি কোত্থেকে আসল? এরকম যে তাদেরকে প্রমাণ করার চেষ্টা

করল যে প্রত্যেক জিনিসেরই স্রষ্টা আছে। গাড়ি ফ্যাক্টরিতে তৈরি, ফ্যাক্টরি কে তৈরি করল? হতে পারে ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিনিয়ারকে কে তৈরি করল? সে চেষ্টা ও প্রমাণ করতে থাকল যে প্রত্যেক জিনিসের একজন স্রষ্টা আছে। অতঃপর সে প্রশ্ন করল সূর্য কে তৈরি করেছে? চাঁদ কে সৃষ্টি করেছে? এবং প্রশ্ন করার সময় সে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি একমত যে জিনিসের একজন স্রষ্টা আছে? যুক্তিবাদীরা হোচট খেয়ে বলল, আমরা একটা শর্তে এটা গ্রহণ করতে রাজি আছি যে, আপনি আপনার বর্ণনা পরিবর্তন ...তে পারবেন না এবং আপনার বর্ণনা থেকে পিছু হটতে পারবেন না।

আমার বন্ধু খুবই খুশি হলেন, আমি সফল হয়ে গেছি নাস্তিকদের বুঝাতে এবং সে পরবর্তী প্রশ্ন করে যাচ্ছিল, সূর্য সৃষ্টি করেছে কে? চাঁদ সৃষ্টি করেছে কে? প্রত্যেক জিনিসের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। আপনাদেরকে চূড়ান্ত স্রষ্টার নাম বলতে হবে। আমি আমার মায়ের থেকে এসেছি, আমার মা তাঁর মায়ের থেকে, চূড়ান্তভাবে কে প্রথম স্রষ্টা? সে তাদেরকে উত্তর দিয়ে সাহায্য করল। প্রথম স্রষ্টা যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ। সে এ চিন্তা করল যে, সে আলোচনায় বিজয় লাভ করেছে। নাস্তিক একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, আমরা একটা শর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে বিশ্বাস করব, আপনি আমাদেরকে বলুন কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন? আমার বন্ধু এজন্য সবচেয়ে বড় আঘাত পান। তিনি উত্তর দিতে পারেননি। তিনি বোবা হয়ে গেলেন। তিনি সারারাত ঘুমোতে পারলেন না।

পরের দিন বন্ধু আমার নিকট আসলেন এবং পূর্ণ বিবরণ আমাকে জানালেন এবং আমি বুঝতে পারলাম, তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, যে কৌশল অনেক পণ্ডিত অবলম্বন করে থাকেন আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য। এ সব পণ্ডিত যুক্তির খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ত্যাগ করেন, যা হলো সবিশ্লেষণ। যদি আপনি আমার কথাকে বিশ্লেষণ করেন, আমার বক্তব্যে কখনো আমি বলি না যে, সবকিছুর একজন স্রষ্টা আছে। কখনো আমি তা বলিনি। যদি তা বলি তাহলে আমি বিপদে পড়বো। বাস্তবে আমি এমন এক লোক, যে নাস্তিককে জিজ্ঞেস করতে এবং নাস্তিককে উত্তর দিতে হতো যে, প্রথম যে সত্তা সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে জানেন তিনিই স্রষ্টা বা ম্যানুফ্যাকচারার। আমি এরূপ বলতাম না সে এটিই বলত, এরূপ কেউ যদি আমাকে এরূপ জিজ্ঞেস করে, ভাই জাকির সেই লোকটি কে, যিনি অজ্ঞাত জিনিসের সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞাত? আমি তাকে বলতাম, প্রত্যেক জিনিস যার শুরু আছে, প্রত্যেক জিনিস যা সৃষ্ট, প্রথম সত্তা যিনি এ ধরনের জিনিসের সৃষ্টি সম্পর্কে বলতে সক্ষম হবেন, তিনিই স্রষ্টা। আমি আমার যুক্তি ব্যবহার করছি। আমি পুনরায় বিপদে পড়তে চাই না। আমি যদি বলি যে, উত্তর হবে প্রথম ব্যক্তিই হবেন ঐ সত্তা, যিনি সৃষ্ট যে কোন জিনিসের গঠন সম্পর্কে বলতে পারবেন, যার থেকে আরম্ভ তিনিই স্রষ্টা, আপনি একই যুক্তি পেশ করে প্রমাণ করতে পারবেন যে, কুরআন আল্লাহর বাণী। জবাব হবে, যেহেতু বিজ্ঞান বলছে যে, সূর্যের প্রারম্ভ আছে, চন্দ্রের প্রারম্ভ আছে, মহাবিশ্বের প্রারম্ভ আছে কে এর সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে জানে? স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহ।

আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? এটা কিছুটা আমার বন্ধুর প্রশ্নের অনুরূপ। সে বলল যে, আমার ভাই টম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে একটি সন্তানও প্রসব করেছিল। আপনি কি বলতে পারেন সন্তানটি ছেলে ছিল না মেয়ে? ডাক্তার হিসেবে আমি জানি পুরুষ কখনো অন্তঃসত্ত্বা হয় না এবং সন্তান প্রসব করতে পারে না। পুরুষের প্রকৃতি এরকমই যে, সে অন্তঃসত্ত্বা হয় না এবং সন্তান প্রসব করা

সম্ভব নয়। এটা একটা অবাস্তব প্রশ্ন। অনুরূপ আল্লাহর পরিচয় যে, তিনি কারো দ্বারা সৃষ্ট নন। তার শুরু নেই। যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন কে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এটা একটা অবাস্তব প্রশ্ন, যেমন আমার বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তার ভাই টম সন্তান প্রসব করেছিল, তার সন্তান ছেলে শিশু ছিল, না কন্যা শিশু। আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আমার নাম মুহাম্মদ আশরাফ। আমি একজন ছাত্র। আমার প্রশ্ন হলো অনেক প্রাচ্যবিদরা দাবি করে যে, নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরবের লোকদের নৈতিক সংস্কারের জন্য কুরআন রচনা করে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার জন্য তা আল্লাহর প্রতি আরোপ করেছিলেন। এটা কি সঠিক?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই একটা প্রশ্ন করেছেন এবং আমিও তার সঙ্গে একমত যে, কতিপয় প্রাচ্যবিদ বলে থাকে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) মিথ্যা বলেছিলেন (নাউযুবিল্লাহ) যে, কুরআন আল্লাহর বাণী যাতে তিনি আরবদের সংশোধন করতে পারেন। আমি আরো একমত যে, কুরআনের বাণী এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য শুধু আরবদের সংশোধনই নয় বরং গোটা বিশ্বের মানুষের নৈতিক সংশোধন আপনি বলেন তা হলে আসুন আমরা এ যুক্তিকে বিশ্লেষণ করে দেখি। যদি তাঁর উদ্দেশ্যই থাকে আরবের সংস্কার তাহলে তিনি কেনই বা অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করবেন একটা নৈতিক সমাজ গঠনের জন্য? মনে করুন আপনি একটি নৈতিক নিরাপত্তা চান অথচ আপনি নিজেই অসত্য দিয়ে আরম্ভ করলেন। এটা শুধু এ সব লোকদের দ্বারাই করা সম্ভব, যারা যশ এবং অর্থ লোভের বশবর্তী হয়ে করে। তারা প্রকাশ্যে বলতে পারে তারা নৈতিক সংশোধন চায়; কিন্তু অপ্রকাশ্যে তারা অর্থই একমাত্র। আর আমি এটা প্রমাণ করেছি যে, নবী করীম (সাঃ) অর্থের জন্য এটা করেননি। সত্য যদি চূড়ান্ত ফল হয় তাহলে মাধ্যমও সত্যই হতে হবে। এটি আল-কুরআনের সূরা আনআমের ৯৩ নং আয়াতে বর্ণিত আছে যে–

অর্থাৎ, সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে নানাবিধ মিথ্যা কথা রচনা করে বেড়ায় অথবা বলে যে, আমার ওপর ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে, (যদিও) তার প্রতি কিছুই অবতীর্ণ করা হয়নি। আর যে বলে আমি অচিরেই আল্লাহ তাআলার নাযিল করা কিতাবের মতকিছু নাযিল করে দেখাব।

নবী করীম (সাঃ) সত্যিই মিথ্যা বলতেন তাহলে তিনি তাঁর কিতাবে একথা কখনো লিখতেন না যে, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে সে জালিম এবং আয়াতটি একটা শাস্তি বর্ণনা দিয়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।

এ কথা সূরা আল-হাক্কার ৪৪ থেকে ৪৭ নং আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে–

অর্থাৎ, রাসূল যদি এ কিতাবটি নিজে বানিয়ে আমার নামে চালিয়ে দিত, আমি শক্ত হাতে তার ডান হাতটি ধরে ফেলতাম, অতঃপর আমি তার কণ্ঠনালী কেটে ফেলতাম। আর যে অবস্থায় তোমাদের কেউই তাকে আমার কাছ থেকে বাঁচাতে পারত না।

এমনকি রাসূলকেও মাপ করা হতো না। কোনো নবীর মিথ্যা ধরা হতো এমনকি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এরও (নাউযুবিল্লাহ)। তিনি কখনো এ ধরনের কাজ করতেন না। এমনকি যদি নবী করীম (সাঃ) মিথ্যা আবিষ্কার করেন, আল কুরআন বলে ঃ আমরা তার কণ্ঠনালী কেটে ফেলতাম। এমন অনেক সুযোগ ছিল যে, নবী করীম (সাঃ) যদি মিথ্যা বলতেন তাহলে তাঁর জীবনের কোন এক সময়ে আল্লাহ নিশ্চিতই তা প্রকাশ করে দিতেন এবং অবশ্যই কোন এক সময়ে মানুষেরা তাকে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করাতো।

একই রকম শাস্তির কথা সূরা শুয়ারা-এর ৪২ নং আয়াতে এরকম সূরা নাহল-এর ১০৫ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও আরো বহু উদাহরণ আছে, যেখানে রাসূল (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। যদি নৈতিক সংশোধনের জন্য রাসূল (সাঃ) নিজে কুরআন রচনা করে থাকতেন তাহলে তিনি এমন বিষয় এতে উল্লেখ করতেন না, যাতে রাসূল (সাঃ)-এর কাজ আল্লাহর পছন্দ নয় এমন কথা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ এ ধরনের আয়াত সূরা আবাসায় বর্ণিত আছে।

অর্থাৎ, তিনি (নবী)– ভ্রূকুঞ্চিত করলেন ও মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কারণ তাঁর নিকট একজন অন্ধ ব্যক্তি হাযির হয়েছিল, তুমি কি জানতে হয়তো সে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিত, কিংবা সে উপদেশ গ্রহণ করত তা তার জন্য হয়তো উপকারীও হতে পারত।

এ সূরা তখন অবতীর্ণ হয় যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) নামে একজন অন্ধ সাহাবী রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আসেন। এতে রাসূল (সাঃ)-এর আলোচনার ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এ সময় তিনি পৌত্তলিক আরব নেতাদের সাথে কথা বলছিলেন, যেহেতু তিনি আরব নেতাদের সাথে কথা বলছিলেন। তিনি যদি নবী ব্যতীত অন্য কেউ হতেন, সাধক, সন্ন্যাসী বা কেউ তাহলেও কেউ আপত্তি করতো না। কিন্তু যেহেতু তিনি নবী যাঁর চরিত্র ছিল সুমহান, সুউচ্চ, যাঁর হৃদয় সব সময় অভাবী দরিদ্রদের জন্য বিগলিত হয়। তাঁর জন্য ওহী অবতীর্ণ হলো এবং যখনই রাসূল তাঁর মানুষের সাথে মিলিত হতেন তিনি তাঁকে এ ধরনের কথা বলে ধন্যবাদ জানাতেন যে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছ।'

আল-কুরআনে এ ধরনের বহু পুনঃপ্রমাণ দান করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ–

সূরা তাহরীম ০১ নং আয়াত, সূরা নাহল ১২৬ নং আয়াত, সূরা আনফাল ৮৪ নং আয়াত।

যদি নবী করীম (সাঃ) নৈতিক সংশোধনের জন্য আল কুরআন রচনা করতেন তাহলে তিনি কুরআনে এগুলো ঢুকাতেন না। আশা করি আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আমি একজন মেডিকেলের ছাত্রী। আপনার বক্তৃতায় আপনি বহু বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি তুলে ধরেছেন। কুরআনে কি গণিতের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বাস্তব ঘটনা আছে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ প্রশ্নকারী বোনটি বলছেন যে, আমি বহু বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা তুলে ধরেছি, এবং প্রশ্ন করেছেন কুরআনে কি গাণিতিক বিষয় উল্লেখ আছে? বা কুরআনে কি গণিতের ওপরে কথা বলেছে?

হ্যাঁ আল কুরআনে গণিত বিষয়ে অনেক তথ্য রয়েছে। গণিতের এরূপ একটি নিয়ম, পুরো গণিত এরিস্টোটল-এর নিয়মের ওপর ভিত্তি করে চলে 'মধ্যপদলোপী' নিয়ম। এতে বলা হয়েছে প্রত্যেক প্রস্তাবনা, যা প্রত্যেক বর্ণনা সত্য বা মিথ্যা হবে। এবং বছরের পর বছর সকলে এ নিয়ম অনুসরণ করল। শত বছর আগে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে বসল যে, যদি প্রত্যেক বিবৃতি প্রত্যেক প্রস্তাবনা সত্য বা মিথ্যা হয় এটাও একটা বর্ণনা এবং এটাও মিথ্যা হতে পারে। যদি এটা মিথ্যা হয় তাহলে কি হবে? পুরো গণিতই অচল হয়ে যাবে। সকল গণিতবিদরা সমবেত হলেন এবং নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, নতুন থিওরী উত্থাপন করলেন, যখনই কেউ কোনো শব্দ ব্যবহার করবে, তখন যে কোন একটি অর্থে ব্যবহৃত হবে। যা অর্থ সম্পর্কে বলবে শব্দ সম্পর্কে নয়। আপনাদের একটা উদাহরণ দিই। যদি আমি বলি আকবর ছোট অর্থনুযায়ী এটা সঠিক। সে ছোট বালক, আকবর ছোট কোন

সমস্যা নেই। কিন্তু যে, লোক আরবি ভাষায় অভিজ্ঞ সে আপত্তি জানাবে। আকবর ছোট নয়। আকবর অর্থ মহান, বিরাট, এখানে আমি শব্দটি উল্লেখ করে ছিলাম। অর্থ নয়। আমাকে আরেকটি উদাহরণ দিতে দিন। মনে করুন যদি আমি বলি 3 সব সময় 4-এর আগে আসে, কারো কোনো আপত্তি নেই কারণ 3 সংখ্যাটি 4-এর আগেই আসে। কিন্তু কোন সংশয়বাদী বলতে পারে 3 আসে 4 এর পরে। কারণ 3 (Three) এর T- ডিকশনারীতে 4 (Four) F-এর পরে আসে। এখানে আমি যখন বলেছি 3, 4 এর পূর্বে আসে, আমি অর্থের দিকেই বলেছি। আমি শব্দের দিকে বলিনি। তর্কবিদ যে আপত্তি তুলেছিল সে শব্দের দিকে বলেছে, অর্থের দিকে নয়।

সুতরাং যখন একটি শব্দ ব্যবহৃত হয় তখন তা দুই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। শাব্দিক অথবা আভিধানিক। আমার বক্তব্যে আমি সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনা? যদি এটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো তরফ থেকে হতো তাহলে তার মধ্যে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত।

অর্থানুযায়ী এটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার। কেউ এর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য পাবে না। সুতরাং কুরআন হলো মহান আল্লাহর বাণী। কিন্তু তর্কবিদ বলবে যে সে কুরআনে বৈপরীত্য পেয়েছে। আমি বলি, কোথায়? সে সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে এ বৈপরীত্য পেল। যেখানে إِخْتِلَافْ শব্দ রয়েছে সুতরাং কুরআন ভুল প্রমাণিত। কুরআনে إِخْتِلَافْ শব্দ রয়েছে, লেখক নিজেই ভুল স্বীকার করছে। আমি বলি অপেক্ষা করুন, পূর্ণ আয়াতটি দেখুন।

এবং إِخْتِلَافْ - إِخْتِلَافًا كَثِيْرًا অর্থাৎ বৈপরীত্য শব্দটি আল-কুরআনে একবার এসেছে। সুতরাং আক্ষরিক দিক দিয়ে কুরআন নিজেও ভুল স্বীকার করেনি। এটা নিরাপদ।

إِخْتِلَافْ শব্দটি একবার উল্লেখ আছে এবং কুরআন বলে إِخْتِلَافًا كَثِيْرًا অনেক বৈপরীত্য। সেগুলো নিরাপদ। অন্য তর্কবিদ বলবে, আমি একমত إِخْتِلَافْ শব্দ মাত্র একবার এসেছে, কিন্তু পবিত্র কুরআন উল্লেখ আছে–

অর্থাৎ, إِخْتِلَافًا كَثِيْرًا - অনেক বৈপরীত্য শব্দটি সেখানে রয়েছে। সুতরাং কুরআন আল্লাহর তরফ থেকে আসেনি। আমি জানি এটা বুঝতে কিছুটা হলেও কঠিন কিন্তু আমি আপনাকে পরবর্তীতে আরো সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। একের বিপরীত অন্যটি مَفْهُوْم مُخَالِفْ — বিপরীত অর্থ সব সময় সঠিক হয় না।

আল-কুরআন বলে, যদি কুরআন না হতো .... তারা কি কুরআনকে যত্ন সহকারে বিবেচনা করে না? যদি এটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো তরফ থেকে আসত, তাহলে অনেক বৈপরীত্য ঘটত।

কুরআন একথা বলেনি যে, যদি এতে অনেক বৈপরীত্য থাকে তাহলে তা আল্লাহর তরফ থেকে নয়। যদি কুরআন বর্ণনা করত যে, যদি সেখানে অনেক বৈপরীত্য থাকত এ গ্রন্থ আল্লাহর নয়। অতএব, তখন কুরআন ভুল প্রমাণিত হতো। আল্লাহ তায়ালা তাঁর শব্দাবলি বাছাই করেছেন। কেননা, বিপরীত অর্থ সব সময় সঠিক হয় না।

ধরুন, আমি যদি বলি মুম্বাইর অধিবাসী অথবা মুম্বাইয়ীরা সবাই ভারতীয়, এটা একটা সত্য বর্ণনা। কিন্তু এর বিপরীত বর্ণনা সত্য হওয়া জরুরি নয়। সব ভারতীয় মুম্বাইতে বাস করে না। মুম্বাইর কেউ কেউ বসবাস করে না। সুতরাং কুরআন বর্ণিত আছে ঃ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا .

অর্থাৎ, যদি যেখানে বৈপরীত্য হয়, যেগুলো আল্লাহর নিকট থেকে, অথবা আল্লাহর নিকট থেকে নাও হতে পারে। কুরআন নিজে নিজের ভুল ধরেনি।

আসুন আপনাদেরকে আরো সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। এটি সূরা মুমিনূন-এর ১ নং আয়াতে বর্ণিত আছে– "সত্যিকার বিশ্বাসীরা সালাতে বিনয়ী হয়।" কেউ আমাকে বলবে, আমি একজন মুসলমানকে চিনি, যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে; কিন্তু সে চুরি করে, সে প্রতারণা করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই অপরাধী রয়েছে। কুরআন বলছে সত্য বিশ্বাসীরা সালাতে বিনয়ী হয়। আমি বলতে চাই, অপেক্ষা করুন! কুরআনের বাণী শুনুন। কুরআন বলে সত্যিকার বিশ্বাসীরা সালাতে বিনয়ী হয়। একথা বলে না যে, যারা সালাতে বিনয়ী, তারা সত্যিকার মুমিন। কুরআন যদি বলতো যারা সালাতে বিনয়ী, তারা সত্যিকার বিশ্বাসী, তাহলে হয়তো কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করা যেত। সুতরাং আল্লাহ হলেন বড় গণিত বিশেষজ্ঞ। তিনি জানতেন যে, কিছু সন্দেহবাদী আছে, যরা কুরআনের ত্রুটি অনুসন্ধানের চেষ্টা করবে। এজন্যই তিনি শব্দাবলি বাছাই করেছেন।

আমি আরো একটি উদাহরণ দিতে চাই। সূরা আলে ইমরানের ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসা এর দৃষ্টান্ত আদম (আ)-এর মতো। তাঁকে তিনি মাটি থেকে তৈরি করে বললেন হয়ে যাও, তো হয়ে গেলেন।"

(আলে ইমরানের ঃ ৫৯)

অর্থানুযায়ী আমাদের কোনো আপত্তি নেই। উভয় যীশু খ্রিষ্ট এবং আদম (আ) মাটি থেকে তৈরি হয়েছিলেন। অর্থানুযায়ী এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার কিন্তু আপনারা যদি কুরআনে ঈসা (আ) অর্থাৎ যীশু শব্দ গণনা করেন, তাহলে ২৫ বার পাবেন। হযরত আদম (আ)-এরও উল্লেখ ২৫ বার। এভাবে অর্থ একই হওয়ার সাথে সাথে, উল্লেখও হয়েছে ২৫ বার করে।

এরূপ আরো উদাহরণ সূরা আরাফের ১৭৬ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, তার উদাহরণ কুকুরের মতো, তার ওপর তুমি বোঝা চাপালে সে হাঁপাতে থাকে এবং তুমি বোঝা না চাপালেও হাঁপায়। এটা হলো ঐ জাতির উদাহরণ, যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে।

আরবি বর্ণনা اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا উল্লেখ করা হয়েছে পাঁচ বার এবং আরবি শব্দ كَلْب (কুকুর) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে পাঁচ বার। অর্থের পাশাপাশি উল্লেখও একইরকম করা হয়েছে।

সূরা ফাতির-এর ২০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ.

অর্থাৎ, অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে না।

আল-কুরআনে ظُلُمٰت (অন্ধকার) বর্ণিত হয়েছে ২৩ বার এবং نُوْر (আলো) বর্ণিত হয়েছে ২৪ বার। অতএব অর্থ সঠিক হওয়ার সাথে সাথে উল্লেখিত অন্ধকারের সাথে আলোর মিল নেই। ২৩ ও ২৪ বার। ২৩ সংখ্যাটি ২৪-এর মতো নয়। যেখানেই কুরআন বলছে এটা এটার মতো সেখানে দুটোর উল্লেখও একই। (কি আশ্চর্য ব্যাপার!) যেখানে বলছে এটা এটার মতো নয়, উল্লেখ করার সংখ্যা হিসেবেও একটি আরেকটির মতো

নয়। এটা শুধু কুরআনের দ্বারাই এতো সুন্দর উদ্ধৃতি করা সম্ভব, কুরআন তো নয়ই কুরআনের মতো অন্য কোনো গ্রন্থ রচনা করা কম্পিউটার দ্বারাও সম্ভব নয়। আপনাকে সূরা আলে ইমরানের ৫৯ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই ঈসা (আ)-এর দৃষ্টান্ত আল্লাহর নিকট আদম (আ)-এর মত, তাঁকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর বললেন হও, তারপর হয়ে গেল।

আল্লাহ পাক আপনাকে খাদ্য দিয়ে পরীক্ষা করেন না কিন্তু কতিপয় ব্যক্তিকে খাদ্য দিয়েও পরীক্ষা করেন. কতিপয় ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য দিয়ে, কতিপয় ব্যক্তিকে দাম্পত্য জীবনে এবং এরূপ বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা করা হয়। যখন আপনি একটা পরীক্ষা দিবেন, আপনি বলতে পারেন না যে, পরীক্ষককে সকলের নিকট থেকে একই পরীক্ষা নিতে হবে।

কিন্তু পরীক্ষা যাই নেয়া হোক, বিচার সঠিক হতে হবে। আল-কুরআন বলে তিনি বিচার দিনের মালিক। আমি তোমাদের যে পরীক্ষাই দেই না কেন, বিচার সে অনুযায়ীই হবে। মনে করুন, আপনি একজন খোঁড়া লোকের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেন। আপনাকে প্রতিযোগিতায় ভারসাম্য মেনে চলতে হবে। সুতরাং আপনি তাকে ১০০ মিটার ড্যাশ দিবেন, আপনি তাকে ৫০ মিটার সামনে দিবেন এবং যার দুটি পা আছে তাকে প্রথম থেকেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে, যাতে উভয়ের একই সুযোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং পরীক্ষার ওপর নির্ভর করে, আপনাকে তিনি বিচার করবেন। আশা করি আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আমি কাশ্মিরা নাজদা ধর্মান্তরিত মুসলমান। আমি M.A ফাইনাল-এর ছাত্রী। আমার প্রশ্ন আপনার বক্তৃতার প্রথম অংশের সাথে সম্পৃক্ত। আপনি বলেছেন, আল-কুরআনে কোনো বৈপরীত্য নেই, কিন্তু কুরআনের একটি আয়াত আছে, যার নম্বর আমি এ মুহূর্তে বলতে পারছি না, কিন্তু আল্লাহ কুরআনে বলেছেন যে, তিনি কিছু ব্যক্তির হৃদয়ে সীলমোহর মেরে দিয়েছেন, এজন্য তারা বুঝতে পারে না। কিন্তু আমরা জানি মন এবং মস্তিষ্ক চিন্তা করে (অন্তর নয়)। আমরা কিভাবে এটা পরিষ্কার করতে পারি?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন একটি খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমি তাকেও ইসলাম গ্রহণের জন্য তিনবার অভিনন্দন জানাতে চাই। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ কুরআনের কোনো কোনো স্থানে, আমিও তাঁর সাথে একমত যে, আল্লাহ অন্তরে সীলমোহর মেরে দিয়েছেন যাতে মানুষেরা সত্যের নিকটে আসতে না পারেন, তাদের সীল মেরে দেয়া হয়েছে।

তিনি প্রশ্ন করেছেন যে, বর্তমানে বিজ্ঞান অনেক অগ্রসর এবং আমরা জানি চিন্তার জন্য প্রধান অঙ্গ হলো মস্তিষ্ক, অন্তর নয়। আগে মানুষ ধারণা করত এটা অন্তর ছিল। সুতরাং তাদের বলায় কুরআনে কোনো ভুল নেই। আপনি যদি উপলব্ধি করেন, আমার বক্তব্যের প্রারম্ভে আমি কুরআনের আয়াত উদ্ধৃতি হিসেবে সূরা ত্বা-হার ২৫ থেকে ২৮ নং আয়াত তিলাওয়াত করেছি যাতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, হে আমার প্রভু! আমার বুককে প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজকে সহজ করে দাও, আমার জিহ্বার জড়তাকে দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা অনুধাবন করতে পারে।

এখানে صَدْرِىْ অর্থ হৃদয় দ্বিতীয়বার ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কেন আল্লাহ আমার হৃদয়কে প্রশস্ত করবেন, আরবি صَدْر (ছদর) শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটা হলো অন্তর, আরেকটি হলো কেন্দ্র। যদি আপনি

করাচি যান আপনি পাবেন, ছদর এরূপ, কেন্দ্র এরূপ। সুতরাং আরবি صَدْر (ছদর) অন্তরের অর্থ ছাড়াও কেন্দ্র অর্থও দেয়। এখানে কুরআন বলেছে যে, আমরা তোমাদের কেন্দ্র, মস্তিষ্ককে সীল মেরে দিয়েছি। আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করি! হে প্রভু! আমার জ্ঞানের কেন্দ্রকে বৃদ্ধি করে দাও, আমার এবং শ্রোতাদের মাঝে অনুধাবনের বাধা দূরীভূত করে দাও। আশা করি প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আমার নাম খালিদ। আমার প্রশ্ন হল এটা কি বৈপরীত্য নয় যে, কুরআন এক জায়গায় ইবলিসকে ফেরেশতা এবং অন্যজায়গায় তাকে জিন বলেছে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই একটা প্রশ্ন রেখেছেন যে, কুরআনে কি এটা বৈপরীত্য নয় যে, বিভিন্ন স্থানে ইবলিসকে ফেরেশতা এবং এক জায়গায় তাকে জিন বলা হয়েছে। আল-কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় ইবলিস এবং আদমের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা বাকারায়, সূরা আরাফে, সূরা হিজর, সূরা ইসরা, সূরা কাহফ, সূরা ত্বাহা, সূরা সা'দ, এবং বিভিন্ন জায়গায় আমি একমত যে কুরআন বলে-

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ .

অর্থাৎ, আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা সিজদা কর, অতঃপর ইবলিস ব্যতীত আর সবাই সিজদা করল। সূরা আল বাকারা ঃ ৩৪

ব্যাখ্যা করলে দেখবেন সাত জায়গায় ইবলিসকে ফেরেশতা বলা হয়েছে। একজায়গায় ইবলিসকে জিন বলা হয়েছে। এটা কি বৈপরীত্য নয়? এটা হলো পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ, কিন্তু কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, আরবীতে তাগলীব নামে ব্যাকরণের পরিভাষা রয়েছে। যাতে অধিকাংশকে সম্বোধন করা হয়। যদিও কম অংশও অন্তর্ভুক্ত। আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন এক শ্রেণীতে ১০০ জনের মধ্যে একজন ছাত্রী এবং বাকি ৯৯ জন ছাত্র। আমি যদি আরবিতে বলি সকল ছাত্র দাঁড়াবে। এমনকি ছাত্রীটিও দাঁড়াবে, কারণ সে তো তাগলীব-এর নিয়ম জানে। কিন্তু যদি আমি ইংরেজিতে বলি সব বালক দাঁড়াও তাহলে শুধু ৯৯ জন বালক দাঁড়াবে, বালিকাটি দাঁড়াবে না।

সুতরাং, কুরআন আরবিতে অবতীর্ণ হয়েছিল। যখন বলছে আমরা ফেরেশতাদের বললাম সিজদা কর, সব সিজদা করল, ইবলিস ব্যতীত।"

এটা বলছে এখানে বেশির ভাগ ছিল ফেরেশতা। ইবলিস ফেরেশতা হতে পারে নাও হতে পারে। সূরা কাহাফের ৫০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সে ছিল জিন, অন্যজায়গাগুলোতে যা বলা হয়েছে, তাতে সে হয়তো ফেরেশতা ছিল। এখানে কোনো বৈপরিত্য নেই। কারণ, আপনাকে আরবি কায়েদা "তাগলীব"-এর প্রয়োগ করতে হবে। ফেরেশতাদের নিজস্ব কোনো ইচ্ছে নেই। আল্লাহ যা বলেন, সঙ্গে সঙ্গে মান্য করেন। জিনদের ইচ্ছের স্বাধীনতা রয়েছে এটাও একটা প্রমাণ যে, ইবলিস জিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমি আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আসসালামু আলাইকুম। এখন আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ হলেন অতিপ্রাকৃত এবং তিনি সবকিছু করতে পারেন। আমার একজন অমুসলিম বন্ধু আছে তাঁর প্রশ্ন হলো- আল্লাহ কেন মানুষের আকার ধারণ করতে পারেন না। আপনি কি ব্যাখ্যা করে বলবেন, প্লিজ।

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোনটি প্রশ্ন রাখলেন যে, আল্লাহ হলেন অতিপ্রাকৃত। তিনি সবকিছু করতে পারেন এবং তার বন্ধু একটা প্রশ্ন রেখেছেন যে, কেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানবাকৃতি ধারণ করতে পারেন না? যেসব

লোক আল্লাহয় বিশ্বাস করে, তারা বলে যে, আল্লাহ অতিপ্রাকৃত এখানকার বাইরেও যারা আল্লাহয় বিশ্বাস করে, তারাও এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ অতিপ্রাকৃত।

আমি জানতে চাই, কোন্ ব্যক্তি এখানকার বাইরে যে আল্লাহ বিশ্বাস করে আবার আল্লাহকে অতিপ্রাকৃত বলে না। প্রত্যেকে, যে আল্লাহয় বিশ্বাস করে, এ বিশ্বাসও করে যে, আল্লাহ অতিপ্রাকৃত। অতিপ্রাকৃত অর্থ প্রকৃতির ওপরে হলো আল্লাহ। যদি বাস্তবতা কুরআন অনুযায়ী চলে যে, আল্লাহ অতিপ্রাকৃত নন। আল কুরআনে দেয়া আল্লাহর ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন, এটা কখনও হবে না যে, প্রকৃতি এটি বলেছে এবং আল্লাহ বলেছেন তার বিপরীত। আল্লাহ প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ আপনার ফিতরাত সৃষ্টি করেছেন। মানুষের ভেতরে প্রকৃতি নিহিত।

কুরআনে প্রদত্ত আল্লাহর অবদানগুলোর একটি হলো "ফাতির" যা হলো আল-কুরআনের একটি সূরার নাম। فَاطِر (ফাতির) শব্দটি فِطْرَةٌ (ফিতরাত) শব্দ থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ নিহিত প্রকৃতি فَاطِر (ফাতির) অর্থ স্রষ্টা, সৃষ্টির মূল কারক; যিনি বস্তুর প্রাথমিক পরিমাপক যন্ত্রের স্রষ্টা, যার সাথে সর্বশক্তিমান আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টির সম্পর্কে হয়। অতএব, রমজানে আমরা যখন রোযা ভাঙ্গি, তাকে ইফতার বলে।" ইফতার অর্থ ভাঙ্গা। একইভাবে فَاطِر (ফাতির) শব্দের অর্থ স্রষ্টা, যার অর্থ আকৃতি প্রদানকারী, গঠনকারী এবং ফেড়ে বের করে আনেন যিনি। আল-কুরআন মানুষদের বলে, তুমি কি ঐগুলো সম্পর্কে চিন্তা কর না? সূর্যের প্রতি তাকাও, চন্দ্রের প্রতি তাকাও, তারা প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলছে। তারা কখনো তাদের নিয়ম পরিবর্তন করে না। তারা সবাই স্বাভাবিক।

একইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (তিনি প্রাকৃতিক নিয়মেই সব কিছু সমাধান করেন।

সূরা আহযাবের ৬২ নং আয়াতে বর্ণিত আছে – وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا .

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন কখনও দেখতে পাবে না।

সূরা রূম-এর ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেছেন–

অর্থাৎ, অতএব হে নবী, আপনি আপনাকে সঠিক দ্বীনের ওপর দাঁড় করান। আল্লাহ তাআলার প্রকৃতির ওপর, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে কোনো পরিবর্তন নেই। এ হচ্ছে সঠিক দ্বীন কিন্তু তাদের বেশিরভাগ তা উপলব্ধি করে না।

বর্তমানে বিজ্ঞান আমাদের কোয়ান্টাম সম্পর্কে ধারণা দেয়। আধুনিক বিজ্ঞান আরো বলে, পর্যবেক্ষক ব্যতীত, আপনি কিছু পাওয়ার সুযোগ নেই। পর্যবেক্ষক ব্যতীত মহাবিশ্ব নিরর্থক। বিজ্ঞানীরা এ ধরনের প্রশ্ন রেখেছেন, প্রথম পর্যবেক্ষক কে ছিলেন? আল্লাহর আরেক অবদান হলো "আর রাশীদ" সাক্ষী। কুরআন বলে আল্লাহই প্রথম সত্তা, যিনি প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং আল্লাহ অতিপ্রাকৃত নন। তিনি প্রাকৃতিক।

আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের ভিত্তি অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন। যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী তাদের অধিকাংশের প্রতি আমি এ প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেই; যাতে তারা আল্লাহকে আরো ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হন। আমি তাদের জিজ্ঞেস করি, আল্লাহ কি যে কোন জিনিস এবং সব জিনিস সৃষ্টি করতে পারেন? তাদের অধিকাংশই বলবে হ্যাঁ। আমার তৃতীয় প্রশ্ন হলো, তিনি কি এমন জিনিস সৃষ্টি করতে পারেন, যা তিনি ধ্বংস

করতে পারেন না? এবং তারা ফাঁদে পড়ে যান। যদি তারা বলেন হ্যাঁ, যে আল্লাহ এমন জিনিস সৃষ্টি করতে পারেন, যা তিনি ধ্বংস করতে পারেন না, তাহলে তারা তাদের দ্বিতীয় বিবৃতির বিপক্ষে চলে যান যে, আল্লাহ সবকিছু ধ্বংস করতে পারেন।

যদি তারা বলেন .... না, আল্লাহ এমন জিনিস সৃষ্টি করতে পারেন না, যা তিনি ধ্বংস করতে পারেন না। এর অর্থ তারা তাদের প্রথম বিবৃতির বিপক্ষে চলে যায়। যার অর্থ আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করতে পারেন। পুনরায় তারা তাদের যুক্তি ব্যবহার করতে পারছেন না, তারা ফাঁদে পড়ে গেলেন। একইভাবে আল্লাহ একজন লম্বা-খাট লোক তৈরি করতে পারেন না। হ্যাঁ তিনি লম্বা লোককে খাট বানাতে পারেন; কিন্তু তিনি তো আর লম্বা থাকলেন না। তিনি একজন খাট লোককে লম্বা বানাতে পারেন, তাতে তো তিনি খাট থাকলেন না। কিন্তু আপনারা লম্বা-খাটো লোক পাবেন না। আপনি মাঝারি মানুষ পাবেন, যিনি লম্বাও নন খাটোও নন। কিন্তু আল্লাহ এমন কোন মানুষ তৈরি করতে পারেন না, যিনি একই সময়ে লম্বা এবং খাট।

একইভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ একজন চিকন মোটা লোক তৈরি করতে পারেন না। হাজার হাজার জিনিস আছে আমি তালিকা দিতে পারি যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ করতে পারেন না (করেন না)। আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন না। যে মুহূর্তে তিনি মিথ্যা বলবেন সে মুহূর্তে তিনি আল্লাহ হওয়ার ক্ষমতা হারাবেন। আল্লাহ অবিচারী হতে পারেন না। যে মুহূর্তে তিনি অবিচারী হবেন, আল্লাহ হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন। তিনি নিষ্ঠুর হতে পারেন না, তিনি ভুলে যেতে পারেন না। আপনি এক হাজার জিনিসের তালিকা করতে পারবেন। তিনি তার রাজত্বের বাইরে আমাকে নিক্ষেপ করতে পারেন না। সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত মহাবিশ্ব তাঁরই। তিনি আমাকে হত্যা করতে পারেন, তিনি আমাকে মুছে ফেলতে পারেন। আমাকে ধ্বংস করে দিতে পারেন কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর রাজত্বের বাইরে নিক্ষেপ করতে পারেন না। সবকিছু তার। কোথায় তিনি আমাকে নিক্ষেপ করবেন?

কুরআনের কোথাও আল্লাহ বলেন নি যে, তিনি সবকিছু করতে পারেন। বাস্তবে আল-কুরআন বলে إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। এটি বলে না যে, আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন। দেখুন :

সূরা বাকারা ১০৬ নং আয়াতে, সূরা বাকারা ১০৮ নং আয়াতে, আলে ইমরান ২৯ নং আয়াতে, সূরা নাহল ৭৭ নং নং আয়াতে, সূরা ফাতির ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে- إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান এবং আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন।" এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সূরা বুরূজের ১৫ ও ১৬ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ 'তিনি যা ইচ্ছে করেন, তাই করেন।'

দেখুন তিনি যা ইচ্ছে করেন, তিনি করতে পারেন; কিন্তু আল্লাহ শুধু আল্লায়ীত্বের কাজগুলোই করেন। তিনি অ-আল্লাহর কাজ কর্ম কখনো করেন না।

আপনার প্রধান প্রশ্নানুপাতে কেন আল্লাহ মানবাকৃতি ধারণ করতে পারেন না? যেটা একজন অমুসলিম রেখেছেন। যে দর্শনে আল্লাহ আকার ধারণ করে তাকে 'এ্যানথ্রোপোমোরফিজম' বলে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ

আকার ধারণ করেন এবং তাদের একটা সুন্দর যুক্তি আছে, যেহেতু সর্বশক্তিমান আল্লাহকে বলতে হয়, জানতে হয়, ব্যক্তিদের শিক্ষা দিতে হয়, যখন কোন মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন সে কেমন অনুভব করে, তাকে মানব আকৃতি গ্রহণ করতে হয়, মানুষকে বলার জন্য কেমন অনুভব করে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তা বলার জন্য। যখনই তুমি সুখী, তখন তুমি কেমন অনুভব কর। যখন তুমি দুঃখিত, তখন তুমি কেমন অনুভব কর। মানুষের করণীয় এবং বর্জনীয় নির্ধারণ করার জন্যও মানবাকৃতি গ্রহণ করতে হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে মানবাকৃতি ধারণ করেন তাকে 'এ্যানথ্রোপোমোরফিজম' বলে। কিন্তু আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন, এ যুক্তি ধোপে টিকবে না।

মনে করুন! আমি তৈরি করলাম, আমি একটি টেপ রেকর্ডারের আবিষ্কারক। আমি একটি টেলিভিশন আবিষ্কার করলাম। টেপ রেকর্ডারের ভাল-মন্দ জানার জন্য আমার টেপ রেকর্ডার হবার প্রয়োজন নেই। আমার একমাত্র কাজ হলো ক্যাসেট চালানোর ক্যাটালগ লিখা। ক্যাসেট ঢুকানো, চলার বটমে টিপ দেয়া, ক্যাসেট চলতে শুরু করবে। স্টপ টিপ দিলে বন্ধ হবে। দ্রুত সামনে যাওয়ার বাটন টিপলে দ্রুত সামনে যাবে। আমাকে একটি ক্যাটালগ তৈরি করতে হবে। একইভাবে মানুষের ভাল-মন্দ জানার জন্য আল্লাহর মানুষ হবার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষের মধ্য থেকে একজন মানুষকে নির্দেশনা ও ক্যাটালগ দেবার জন্য বাছাই করেন। ক্যাটালগ কোনটি? আল-কুরআন হলো মানব জাতির জন্য ক্যাটালগ, যার মধ্যে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় নিহীত রয়েছে, তাদের জন্য কি ভাল, কি মন্দ তা আল কুরআনে যথেষ্ট। তাঁর মানব হবার কোন প্রয়োজন নেই। কেন? আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, আল্লাহ কি মানবাকৃতি ধারণ করতে পারেন না? হ্যাঁ তিনি পারেন, তবে যে মুহূর্তে তিনি মানবাকার ধারণ করবেন, সে মুহূর্তে তিনি আল্লাহ হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন। কারণ, আল্লাহ অমর। মানব মরণশীল, আপনি একই সাথে মরণশীল আর অমর হতে পারেন না। এটা একই ব্যক্তির একই সাথে লম্বা-খাট হওয়ার মতো অবাস্তব। মানবের কিছু সুনির্দিষ্ট গুণাবলি থাকবে, তাদের কিছু বাধ্যবাধকতা আছে। যেমন তাদের খেতে হয়, সূরা আনআমের ১৪ নং আয়াতে বর্ণিত এসেছে–

অর্থাৎ, বলুন, আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে আমার রক্ষক হিসেবে গ্রহণ করবো? যে আল্লাহ আসমান ও জামিনের স্রষ্টা, যিনি সবাইকে খাওয়ান কিন্তু তিনি নিজে খান না।

মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন। আল্লাহর কি খাবার প্রয়োজন হয়? না। মানুষের ঘুমের প্রয়োজন আছে।

সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন : لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ "তাকে তন্দ্রা কিংবা নিদ্রা স্পর্শও করে না।"

আল্লাহর ঘুমের কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষের ঘুমের প্রয়োজন, বিশ্রামের প্রয়োজন, খাদ্যের প্রয়োজন, আল্লাহ কিভাবে আসবেন একই সময়ে মরণশীল এবং অমর হবেন। এটি অযৌক্তিক।

যদি আপনি বলেন, আল্লাহ মানবাকৃতি ধারণ করতে পারেন, মানুষের গুণাবলি গ্রহণ করেন, আপনি নাস্তিককে একটা চাবুক তুলে দিলেন আপনাকে আঘাত করার জন্য। আল্লাহ অতি প্রকৃত নন, সবকিছু করতে পারেন, আল্লাহ মানবাকৃতি ধারণ করতে পারেন না, আল্লাহ প্রাকৃতিক। আল্লাহর সকল কিছুর ওপর ক্ষমতা রয়েছে। তিনি তাঁর ইচ্ছেনুযায়ী সব কিছু করেন এবং তিনি মানব আকৃতি ধারণ করতে পারেন না।

প্রশ্ন ঃ আমার নাম অস্টিন ফিলিপস্ আমি একজন খ্রিস্টান। এখানে আমার মনে যা আসছে, তা হলো ইসলাম যীশু খ্রিস্ট সম্পর্কে কথা বলে। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, যীশু খ্রিস্ট ছিলেন। ইসলাম যীশু খ্রিস্টের বিশ্বাস, হত্যা এবং তাঁর পূর্ণাঙ্গ আগমনের ওপর বিশ্বাস করে না। এটা ইসলাম বিশ্বাস করে যে, তিনি প্রভু কর্তৃক উর্ধ্বে উত্তোলিত হয়েছিলেন। ইসলাম বলে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তোলিত হন নি। একজন মুসলিম বন্ধু আমাকে বললেন যে, ইসলাম বিশ্বাস করে যে, যীশু কুমারী মাতার সন্তান এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা জন্ম লাভ করেন এবং স্বাভাবিক নিয়মে জন্মগ্রহণ করেন নি। এটা এখন প্রমাণিত যে, যীশু খ্রিস্ট যদিও খোদা নন, তবুও তিনি অন্ত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চেয়ে বড়। এখন আপনি কেন বিবেচনা করেন না যদি আপনি মুহাম্মদের শিক্ষা পেয়ে থাকেন। কেন আপনি যীশুর শিক্ষাও দেন না, যা বাইবেলে রয়েছে।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই একটা অত্যন্ত ভালো প্রশ্ন করেছেন এবং এ ধরনের প্রশ্ন প্রধানত খ্রিস্টান মিশনারীরা করে থাকেন। আমি জানি না তিনি কি একজন এবং তিনি কি ২-৩ টা দৃষ্টান্ত দিতে পারতেন কিনা যে, ইসলাম যীশু সম্পর্কে কি বলে। তিনি বলেছেন যে, কুরআন বলে যীশু খ্রিস্টকে জীবন্ত তুলে নেয়া হয়েছিল। প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নয়। যীশু খ্রিস্ট একজন কুমারীর জন্ম। মুহাম্মদ (সাঃ) -এর পিতা-মাতা ছিলেন। কে বড়? মন উত্তর দেয়, কে বড়? যীশু? অতঃপর তিনি বলেন, এ ধরনের একাধিক প্রশ্ন রয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, যীশু খ্রিস্টকে ২৫ বার এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নামে মাত্র ৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে। বড় কে? তারা প্রশ্ন রাখে মুসলিম হিসেবে আমাদের অন্তর বলে। কে বড়? যীশু খ্রিস্ট সুতরাং তাকে যীশু সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

ভাই, ইসলাম হলো একমাত্র অখ্রিস্টান বিশ্বাসের নাম, যেখানে যীশু সম্পর্কে বিশ্বাসকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি অলৌকিকভাবে, যে কোনো উপায়ে পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে জন্ম গ্রহণ করেছেন, যা আধুনিক যুগের অনেক খ্রিস্টানরাও বিশ্বাস করে না। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহর অনুমতি নিয়ে মৃতকে জীবিত করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি না যে, তিনি আল্লাহর জাত, আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন।

আপনার প্রশ্নানুসারে বলছি, কুরআন উল্লেখ করে যে, যীশু খ্রিস্টকে জীবদ্দশায় তুলে নেয়া হয়েছিল, তা এ দিকে ইঙ্গিত করে না যে, আল্লাহর পরে কেউ আছে কিনা? যদি কেউ কাউকে বলি দেয়, যদি কাউকে কুরবানী দেয়, তাদের মধ্যেকার সর্বোত্তম ব্যক্তিকেই কুরবানী দিতে হবে, তাদের মধ্যে যীশু খ্রিস্ট ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। আল-কুরআনের মতে তাকে কুরবানী করা হয় নি। আল-কুরআন বলে, وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ "তারা তাঁকে হত্যাও করে নি; শূলেও চড়ায় নি।"

আমরা একমত, আপনাদের বাইবেলের মতে, মিথ্যা রিডিং ----- এর মতে বাইবেল আরো বলে! তাঁকে শূলে চড়ানো হয় নি ... যে ইহুদিকে শূলে চড়িয়েছিল বেশিরভাগ লোক তাঁকে আল্লাহ রাসূল হিসেবে গ্রহণ করেনি। তারা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে গিয়েছে।

সূরা নিসার ১৭১ নং আয়াতে বর্ণিত আছে

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ .

অর্থাৎ, হে কিতাবধারিগণ। তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।

বাড়াবাড়ি কি? দুটি বাড়াবাড়ি। ইহুদিদের মতে, তিনি ছিলেন জারজ সন্তান, খ্রিষ্টানরা বলে তিনি ছিলেন আল্লাহ। বাড়াবাড়ি। আল্লাহ হওয়ার ব্যাপারে কথা বলা উচিত ছিল না, সত্য কথা সত্যিই থাকে, আল্লাহ একজনই। তাকে তুলে নেয়া হয়েছিল কারণ সেখানে ভ্রান্ত ধারণা ছিল। তাঁর দ্বিতীয় আগমনে তিনি আমাদের নতুন কিছু শেখাবেন না।

সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করলাম এবং জীবনবিধান হিসেবে ইসলামকে নির্ধারণ করলাম।

আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি যে, যীশু আগমন করবেন তবে তিনি আমাদের নতুন কিছু শিক্ষা দিবেন না, তিনি ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য আগমন করবেন। আল্লাহকে বলবেন, হে আল্লাহ তাআলা! তুমি আমার সাক্ষী থাক যে, আমি তাদেরকে কখনো বলিনি যে, তোমরা আমার ইবাদত কর। আমি তাদের কখনো বলিনি যে, তারা আমাকে আল্লাহ জাত পুত্র বলবে। তিনি খ্রিস্টানদের (ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের) জন্য আগমন করবেন, মুসলিমদের জন্য আসবেন না। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি আগমন করবেন।

আপনি বলেছেন যে, তিনি কুমারী মাতার সন্তান। মনে করুন, যদি কোনো লোকের বাপ না থাকে, যেহেতু তাঁর বাপ নেই এ কারণে যদি আপনি দাবি করেন যে, তিনি সর্ব শক্তিমান আল্লাহ। আল-কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৫৯ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই ঈসা এর দৃষ্টান্ত আল্লাহর নিকট আদম (আ) এর মতো, আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, হয়ে গেল।

তাঁর বাপ ছিলেন না, আদম (আ)-এর বাপ-মা কেউই ছিলেন না। যদি কোনো ব্যক্তির বাপ না থাকার কারণে তাকে আল্লাহ বলতে হয়, তাহলে আদম (আ) ছিলেন বড় আল্লাহ। এটা আপনাদের বাইবেলে বলে, কুরআন এ ধরণের বলে না। বাইবেল আরেকজন অতিমানব সম্পর্কে বলে "কিং মালচিসিডেক" সম্পর্কে, যিনি আগমন করেন নি, অবতরণ করেন নি, যার কোনো আরম্ভ নেই, পরিসমাপ্তি নেই। তিনি আদম (আঃ) এর চেয়েও বড় তাকে নাম ধরে ২৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মাত্র ৫ বার কেন? যীশু-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল না এবং কুরআন যখন অবতীর্ণ হচ্ছিল, তখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

সুতরাং আমি যদি কোনো উপস্থিত লোককে সম্বোধন করি তাহলে আমাকে শুধু বলতে হয় তিনি হে নবী, হে রাসূল! সকল সময় তাঁর নাম নেয়ার প্রয়োজন নেই। যদি আমাকে নিতে হয়। যেমন জনাব xyz যেহেতু কুরআন অবতীর্নের সময় যীশু সেখানে ছিলেন না, তাঁর নাম নিতে হয়েছে। এজন্যই কুরআনে মূসা (আ)-এর নাম ১৩২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। এটা কি এ কথা বুঝায় তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ), ঈসা (আ)-এ দুজনের চেয়ে বড়? না বরং তাঁরা দু'জনই অনুপস্থিত ছিলেন। যখনই তাদের কোন দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে তাঁদের নাম নিতে হয়েছে। যিনি উপস্থিত তাঁর নাম এতবার নেবার প্রয়োজন হয় নি। আশা করি প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছি।

প্রশ্ন ঃ আমার নাম ইসরাত আনসারী এবং আমি একজন বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েট, বর্তমানে আমি ইসলামিক ষ্টাডিজ এম. এ করছি। আমার প্রশ্ন হলো. কুরআনে উল্লেখ আছে যে, মায়ের গর্ভের শিশু ছেলে-মেয়ে হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কেউই অবগত নয়। যা হোক আধুনিক বিজ্ঞান কিছু পরীক্ষার ব্যাপারে এতোদূর অগ্রসর হয়েছে যে, যা দ্বারা মাতৃগর্ভের সন্তানের ছেলে-মেয়ে হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। এটা কী বৈপরীত্য নয়?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন! একটা প্রশ্ন রেখেছেন যে, কুরআন উল্লেখ করেছে যে, মাতৃগর্ভের শিশু ছেলে-মেয়ে হওয়ার বিষয়টা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না এবং আজ আমি তাঁর সাথে একমত যে, অনেক ডাক্তারি পরীক্ষা যেমন, এমিওনেটেনসিস, আলটাসনোগ্রামী, যা শিশু ছেলে-মেয়ে হওয়ার বিষয়টা নিশ্চিত করতে পারে। সুতরাং এটা কি ভুল নয়– কুরআনের বৈজ্ঞানিক ভুল নয়?

বোন যেটা উল্লেখ করেছেন সেটা হলো সূরা লুকমানের ৩৪ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ অবশ্যই আল্লাহ তাআলার কাছে কিয়ামতের জ্ঞান আছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন তিনি জানেন মায়ের গর্ভে কি আছে, কোনো ব্যক্তি জানে না আগামীকাল সেকি লাভ করবে, কেউ জানে না কোথায় তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জ্ঞাত।

আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ এ পাঁচটি জিনিস সম্পর্কে নেই। তার মূল প্রশ্ন হলো যে, কুরআন ঘোষণা দিয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ মাতৃগর্ভের সন্তানের ছেলে-মেয়ে হিসেবে পরিচয় অবগত নহে, তা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে তা অবগত হচ্ছে

বোন! ভ্রান্ত ধারণার কারণ হলো কিছু অনুবাদ, বিশেষ করে উর্দুতে যাতে বলা হয়েছে আল্লাহ ব্যতীত মাতৃগর্ভের সন্তানের ছেলে-মেয়ে হওয়ার বিষয় অপর কেউ অবগত হবে না। আরবিতে ছেলে-মেয়ে হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ নেই। কুরআনে বলেছেন "আল্লাহ ব্যতীত কেউ মাতৃগর্ভে কি আছে তা অবগত নহে।" আল-কুরআন এখানে নারী-পুরুষের উল্লেখ করেনি। এই শিশু কিরূপ হবে সেদিকে ইঙ্গিত করে। সে কি সৎ হবে? নাকি অসৎ হবে? সে সমাজের জন্য অভিশাপ হবে নাকি আশীর্বাদ? সে কি প্রকৌশলী হবে? নাকি ডাক্তার হবে? সুতরাং বিশ্বাস করুন! আপনাদের সকল চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নিয়েও বলতে পারবেন না যে, ঐ ব্যক্তি কি হবে? এটা ভ্রান্ত অনুবাদ।

পরবর্তী প্রশ্ন আসার আগে, সেটা খুবই ভালো প্রশ্ন, তিনি বলেন যে, এটা ভাইকে বিরক্ত যেন না করে, আপনি যা বলতে চান আপনি মাইকের সম্মুখে আসুন, ভাই এটা বেশি ভাল হয় যদি আপনি মাইকে এসে বলেন। আমি তাকে সুযোগ দিতে চাই,, যদিও তিনি একজন অমুসলিম, সমস্যা নেই। তিনি বলেছেন, হতে পারে আমি ভুল দিকে নিচ্ছি, যদি আরবি মূল ভাষার মধ্যে, আরবি পরিভাষার মধ্যে কঠিন কিছু থেকে থাকে। অমুসলিমদের লিখিত অনেক অভিধান আছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো "লেন লেক্সিকন"। লেন লেক্সিকন দেখুন, অমুসলিমদের রচিত, তারা বলবে আল-কুরআনের মূল আরবি টেক্সট-এ ছেলে -মেয়ের কথা নেই। তারা ছেলে-মেয়ের ব্যাপারে বলবে না।

আরেকটি বিষয়, সেটা হলো বিচার দিবস সম্পর্কে কতিপয় ব্যক্তি আছে যারা ভবিষ্যদ্বাণী করে। এ ধরনের ঘটনা ১৯৯২ সালে ভারতে সংঘটিত হয়। একটা কোরিয়ান চার্চ ছিল, যারা ঘোষণা করল পৃথিবী ১৯৯২ সালের

নভেম্বরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঐ চার্চের ঘোষণা অনুযায়ী সব লোক সেখানে আসল, কিন্তু ঐরূপ কিছুই ঘটল না। আমরা এখনো জীবিতই আছি এবং লোকজন অর্থ নিয়ে পালাল। পৃথিবী কখন শেষ হবে তা কেউই জ্ঞাত নহে।

বৃষ্টিপাত সম্পর্কে, কতিপয় ব্যক্তি বলে যে, এটি বিজ্ঞানের দ্বারা উন্নতি লাভ করেছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস কেন্দ্রের মাধ্যমে আপনি জানতে পারেন কোথায় এবং কখন বৃষ্টি হচ্ছে। আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলছি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস, কতখানি সঠিক আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী, বিশেষ করে ভারতের। ঠিক আছে, কেউ আমেরিকার নাম নিতে পারে এবং একে সঠিক মনে করতে পারে। যুক্তির খাতিরে এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করলাম। তাদেরকে ঝোলার জন্য রশি দিন। আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র মেঘ দেখে এবং বাতাসের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তারা বলে থাকে কখন এবং কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হতে পারে। এটা বড় কিছু নয়, বৃষ্টি তো মেঘের মধ্যেই বিদ্যমান। এটা এ ধরনের, মনে করুন এক লোক পরীক্ষা দিল, ফলাফল একমাস পরে হবে, শিক্ষক উত্তরপত্রগুলো তিন সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষা করে জানলেন যে, অমুক প্রথম হচ্ছে ইনি ৯৩ নম্বর পেয়েছেন। এ কারণে যে তিনি অনেক আগেই অবগত হতে পেরেছেন। এটা বড় কিছু নয়, যেহেতু তিনি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেছেন। নোটিশ বোর্ডে আসবার এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি জানতে পারলেন যে, কে প্রথম হলো, এটা বড় কিছু নয়।

বৃষ্টি মেঘের মধ্যেই বিদ্যমান। বড় কিছু হত যদি আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র সঠিকভাবে আজই বলতে পারতো ২০০ বছর পরে কোথায় কখন বৃষ্টি হবে মেঘ না দেখেই। আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি কোনো আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র ২০০ বছর পরে কোথায় কি পরিমাণ বৃষ্টি হবে তা যদি বলতে পারে। তারা কখনোই এটা করতে সক্ষম নয়।

কখন কোথায় কোন লোক মৃত্যুবরণ করবে। কোনো লোক বলতে পারে, আমি আত্মহত্যা করব আমি এখানে মৃত্যুবরণ করব। বেশিরভাগই এ বিষয়ে ব্যর্থ হয়। কত লোক আত্মহত্যা করতে চায়? খুবই কম সংখ্যক, একেবারে সামান্য সংখ্যক এবং এ ব্যাপারে উদ্যোগী তারা বেশির ভাগই ব্যর্থ হয়। বিষ গ্রহণের পর তারা যায় অথবা অন্যদেরকে বলে এবং হাসপাতালে যায়। তারা যখন লাফ দেয় তারা দেখে নিরাপদ অবতরণ কোথায় হয়। এমনকি যদি আপনি লাফ দেনও এবং আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করতে চান, তিনি আপনাকে রক্ষা করতে পারেন। যদি আপনি মৃত্যুবরণ করতে চান তাও তাঁর অনুমতিতেই, তার অনুমতি ব্যতীত নয়।

সর্বশেষ অংশের কথা, কেউই অবগত নয়, সে কত লাভ করবে। আপনি বলতে পারেন দেখুন ভাই জাকির আমি জানি যে, আমি মাসে ২ হাজার রূপী আয় করি, দেখুন কুরআনে ভুল আছে। আল কুরআন তাদের আয় সম্পর্কে এখানে বলে নি, অর্থের দিক দিয়ে বলে নি, এখানে تَكْسِبُ বলা হয়েছে। আরবিতে تَكْسِبُ শব্দটি ভালো-মন্দ কাজ অর্জনও বুঝায়। এটা শুধু বেতন অর্জনই বুঝায় না। এমনকি আপনি যদি দানও করেন তাতেও আপনি জানেন না কত ছওয়াব পাবেন। আপনি কখনো জানতে পারবেন না ভালো কাজ করে আপনি কত রহমত লাভ করলেন এবং খারাপ কাজ করে আপনি কি পরিমাণ গুনাহগার হবেন। প্রত্যেকটাই আল্লাহর সংরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আশা করি প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছি।

প্রশ্ন ঃ আপনি জানেন অ্যারন শৌরী ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক আর্টিকেল ও বই রচনা করেছেন। আপনি কেন তাকে জনসমক্ষে বিতর্কে চ্যালেঞ্জ দেন না?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ইনি একটা প্রশ্ন রেখেছেন যে, আমি জানি অ্যারন শৌরী ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক আর্টিকেল ও বই পুস্তক লিখেছেন এখন আমি তাকে জনসমক্ষে বিতর্কের চ্যালেঞ্জ দিই না।

ঐ সব আর্টিকেল আমি পড়েছি। মূলত দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে বেশির ভাগ আর্টিকেলই রচিত:

এক, অ্যারন শৌরী নারীদের সম্পর্কে বলছে, যারা তাদের সমঅধিকার পায় নি।

দুই . ইসলাম সম্পর্কে যে, এটা সন্ত্রাসী ধর্ম, নির্দয় ধর্ম এবং কিছু এখানে সেখানের পয়েন্ট , যেমন এক ভাই বললেন, আল্লাহ গণিত জানেন না ইত্যাদি। আসুন আমরা ব্যাখ্যা করি। বিশ্বাস করুন! তাদের সব , আমি যেমন উল্লেখ করেছি, মূলের বাইরে ভুল অনুবাদ এবং ভুল উদ্ধৃতি। ভাই ঠিকই বলেছেন আমি এটি পরিষ্কার করতে পারি এবং আমি তাই করছি।

প্রশ্নটি হলো অ্যারন শৌরীকে আমি কেন জন সমক্ষে বিতর্কে আহবান করছি না, যেহেতু সে ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক বই পুস্তক রচনা করেছে।

যদি আপনি তার সর্বশেষ বই "বিশ্ব ফাতওয়া বাস্তব শারিআ" পাঠ করেন, যেটা মুম্বাই থেকে সপ্তাহ খানেক আগে প্রকাশ হয়েছে। এর প্রচ্ছদে সে কুরআনের সূরা ফাতাহ-এর ২৯নং আয়াতের আরবি দ্বারা সুন্দর নাম দিয়েছে, যাতে বর্ণিত আছে -

অর্থাৎ : মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমানদার কাফিরদের সাথে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

ফুলস্টপ, যদিও সেখানে কোনো ফুলস্টপ নেই, পুনরায় মূর উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় মুসলমানগণ অবিশ্বাসীদের ওপর নির্দয় । সে উদ্ধৃতি দিচ্ছে, যদি আপনি মূল অংশটি পড়েন। সূরা আল -ফাতাহ আয়াত নং ২৫ - বর্নিত হয়েছে।

অর্থাৎ, তারাই তো কুফরী করেছে এবং তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা দিয়েছে এবং বাধা দিয়েছে অবস্থানরত কুরবানীর জন্তুদেরকে যথাস্থানে পৌছতে।

এ অবিশ্বাসীরা একসময় মুসলীমদের হজ পালন করা থেকে বাধার সৃষ্টি করেছিল। আমি বলতে চাই যদি কোনো লোক কোনো খ্রিস্টানকে ভ্যাটিকান সিটিতে প্রবেশে বাধা দান করে তাহলে কি সে তাকে ভালোবাসতে পারবে? তাকে আলিঙ্গন করবে? এটাই স্বাভাবিক যে,তাকে ভালোবাসতে পারে না। মনে করুন একজন হিন্দু যদি তার তীর্থস্থান বেনারসে যাবার ব্যাপারে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে তিনি এটা পছন্দ করবেন? না! অনুরূপভাবে যদি আপনি মূল আরবি পড়েন, এতে বলা হয়েছে যে, ঐ সব ব্যক্তি, যারা আপনাকে পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করা থেকে বাধা সৃষ্টি করে এবং আপনাকে পশু কুরবানী করা থেকে বাধা সৃষ্টি করে, আপনি তাদের ব্যাপারে শক্ত হোন এবং বিশ্বাসীদের ভালোবাসেন।

আমি আপনাকে যে গ্রন্থের কথা বললাম তার ৫৭১ ও ৫৭২ পৃষ্ঠা তার খুব প্রিয় আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছে, তার খুবই প্রিয় আয়াত সূরা তাওবাহর ৫নং আয়াতে বর্ণিত আছে যে, নিষিদ্ধ চার মাস পরে অবিশ্বাসীদের ধরুন। ব্রাকেটের মধ্যে হিন্দুদের ধরুন অবিশ্বাসীদের ধরুণ এবং তাদের হত্যা করুন, তবে যদি তারা যাকাত দেয়, সালাত আদায় করে তাহলে তাদের ছেড়ে দিন। এদিকে নির্দেশ করে যে, যদি কোন মুসলমান কোনো হিন্দুকে পায় তাহলে তাকে হত্যা কিংবা জবাই করবে। কিন্তু যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তাকে ছেড়ে দাও। এরপর সে আরো উদ্ধৃতি দিচ্ছে। সূরা তাওবাহর ১ম আয়াত থেকে। মক্কার মুশরিক ও মুসলমানদের মধ্যে একটা চুক্তি ছিল। এ চুক্তি মুশরিকদের দ্বারা ভঙ্গ হয়েছিল। এ কারণে আল্লাহ সতর্ক করে দিচ্ছেন।

জিনিসগুলো সোজা রেখে দিন, চারমাসের জন্য অথবা যুদ্ধের ঘোষণা দিন। এতে বলা হয়েছে যুদ্ধকালীন যখন আপনি এ ধরনের অবিশ্বাসীদের পাবেন যারা শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করেছিল, তাদেরকে ছিনিয়ে আনুন এবং হত্যা করুন। মনে করুন, ভিয়েতনাম ও আমেরিকার মাঝে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দেয় যে, যেখানেই ভিয়েতনামীদের পাবে হত্যা করবে। যদি আমি সে কথা আজ উদ্ধৃত করি এবং বলি যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেছেন, "ভিয়েত-নামীদের হত্যা কর যেখানেই তাদের পাও।" এটাই সঠিক হবে যে সে হন্তা। আমি মূল উদ্ধৃতি দিচ্ছি। মূলে, এটাই স্বাভাবিক যে নেতা বা প্রেসিডেন্ট সর্বদা বলবে যে, যখনই শত্রু আসবে, যুদ্ধ করতে দিবলম্বা করবেন না। এটাই নীতি। সুতরাং কুরআন যদি ঐরূপ বলে, তাতে দোষের কি আছে?

অতঃপর ৫৭২ পৃষ্ঠায় আয়াত নং ০৫, মাঝখানের আয়াত বাদ দিয়ে ৭, ৮-নং আয়াত চলে গেছে। ৬ নং আয়াত বাদ দিয়েছে। আপনি কি জানেন, কেন? ৬ নং আয়াতে উল্লেখ আছে যে, যদি এ ধরনের কোনো মুশরিক, অবিশ্বাসীরা নিরাপত্তা চায় তাহলে তাদের দিয়ে দাও, যাতে তারা মহান আল্লাহর বাণী শ্রবণ করতে পারে এবং তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান কর। আল-কুরআন বলেনি যে, তাদের নিরাপত্তা দিয়ে দাও, তাদের যেতে দিও না। আল কুরআন বলে তাদেরকে নিরাপত্তা দাও এমনকি মুশরিকরা যদি ইসলাম গ্রহণ নাও করে। যদি তারা নিরাপত্তা চায় তাহলে তাদের যেতে দিও না বরং নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। কোন সৈন্য বাহিনীর জেনারেল বলে যে, যখন শত্রু চলে যেতে চায়, তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। কোন্ সৈন্য বাহিনী ঐরূপ? আমি জানতে চাই, সৈন্য বাহিনীর কোন্ জেনারেল আজ বলবে যে, যদি শত্রু শান্তি চায়, তাকে ছেড়ে দিও না, বরং তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। এটাই যা আল-কুরআন বলছে, মূল উদ্ধৃতি দিয়ে, তার পক্ষের বিষয় যে, মুসলমানরাই নির্দয়-মূলের বাইরে, সকল উদ্ধৃতি মূলের বাইরে।

একইভাবে এ আয়াতগুলো তাসলিমা নাসরিনের মতো ব্যক্তিদের দ্বারা উদ্ধৃত হয়। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন আমি অ্যারন শৌরীর সঙ্গে বিতর্কে সম্মত হই না। আমি তাসলিমা নাসরীনের ব্যাপারে মুম্বাইতে সাংবাদিক সমিতির আয়োজনে এক বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। যেটা ছিল প্রেস বিতর্ক, তাদের আয়োজনে। ঐ বিতর্কে যখন আমি তাদের বললাম, আমি বিতর্কটি ভিডিও রেকর্ড করবো, BUJ আমাকে অনুমতি দেয়নি। আপনারা জানেন বিষয়টা কি ছিল। বিষয় ছিল "ধর্মীয় মৌলবাদীত্ব মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তরায় কিনা?" মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বক্তব্য অথচ মুনাফিকেরা আমাকে টেপ রেকর্ড করতে দিবে না? কেন?

আমি তাদের অঙ্গীকার দিলাম, আমি আপনাদের ঐ ক্যাসেটের একটা অনইডিটেড কপি দেখার জন্য দিব। তারা আমাকে অনুমতি দেয়নি। অনেক পীড়াপীড়ির পর তারা শেষে অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। আপনারা জানেন কি ঘটেছিল। আল্লাহর রহমতে বাইরে সব লোক ইসলামকে বানানোর জন্য জাকিরকে বানানোর জন্য অপেক্ষা করছিল। আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে আমার বুদ্ধির জোরে নয়, এটা ছিল আল্লাহর রহমতে বিতর্ক খুবই সফল হয়েছিল। এটা এতই সফল হয়েছিলেন যে, একটা পত্রিকাও সংবাদ প্রকাশ করে নি।

এ সমস্ত বিতর্কে খ্রিষ্টানদের থেকে ছিলেন ফাদার প্রেইরা, হিন্দুদের পক্ষ থেকে ছিলেন ডা. বেদ ভাইয়াস, ইসলামি দিকে আমি ছিলাম, সেখানে মারাঠি ভাষায় "লজ্জা" বই-এর অনুবাদক মিঃ অশোক সাহানী উপস্থিত ছিলেন, বিষয় বস্তু তাসলিমা নাসরিন। যদি এই ক্যাসেট না থাকত তাহলে কে এগুলো জানত? বর্তমানে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এগুলো দেখছেন; শুধু মুম্বাইতেই নয়, বরং সারা বিশ্বব্যাপী। তার দ্বিতীয় বিষয় ছিল "নারী" সম্পর্কে। সব উত্তর ক্যাসেটে দেয়া হয়েছে। যা পরিষ্কার করেছে এ্যারন শৌরীসহ এ ধরনের লোকদের ভ্রান্ত ধারণাকে।

বিতর্ক সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল– আমি অবগত হতে চাই, বিতর্কের কি কোন মূল্য আছে? তার বিতর্কে কোন লাভ নেই, সে যদি চায় তাহলে বিতর্কে আসতে পারে। আমি স্বাগতম জানাই "আহলান ওয়াসাহলান" বিজ্ঞ লোক সমাগমে। আমি লোক সমাগমে বিতর্ক করব, চলমান ভিডিও রেকর্ডারের সম্মুখে, ঘরের কোণে নয়, আশা করি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে সক্ষম হয়েছি।

সমাপনী বক্তব্য

ডা. জাকির নায়েক কর্তৃক শ্রোতৃবৃন্দের প্রদত্ত সর্বশেষ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ডা. মুহাম্মদ তাঁকে (ডা. জাকির নায়েককে) ধন্যবাদ দেন তার নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বক্তৃতা প্রদানের জন্য। ডা. মুহাম্মদ বিশেষ অতিথিবৃন্দ ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে অনুষ্ঠানের কর্মসূচি সফল করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সময়ের অভাবে অনুষ্ঠান শেষ করার কারণে তিনি দুঃখও প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন যদি অনুষ্ঠান আরো দীর্ঘ করা যেত তাহলে শ্রোতাদের আল-কুরআন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদনে আরো সুযোগ হতো। যাহোক, তিনি প্রত্যহ রোববারে এ ধরনের অনুষ্ঠান অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান।